সেতুপত্র

জানুয়ারি–মার্চ ২০০৪

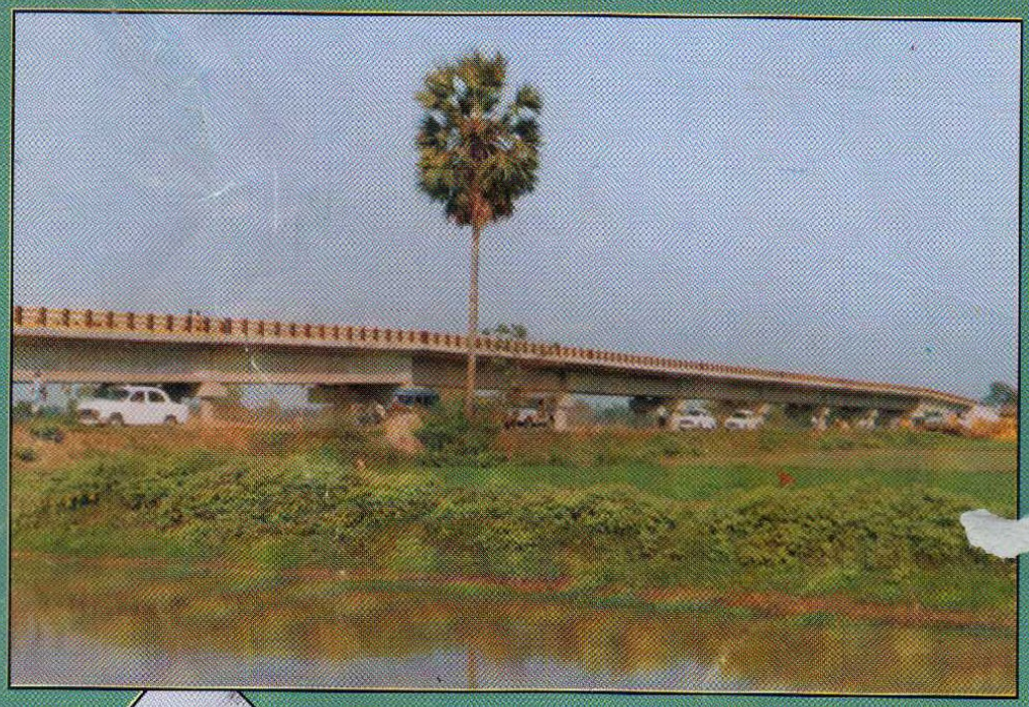

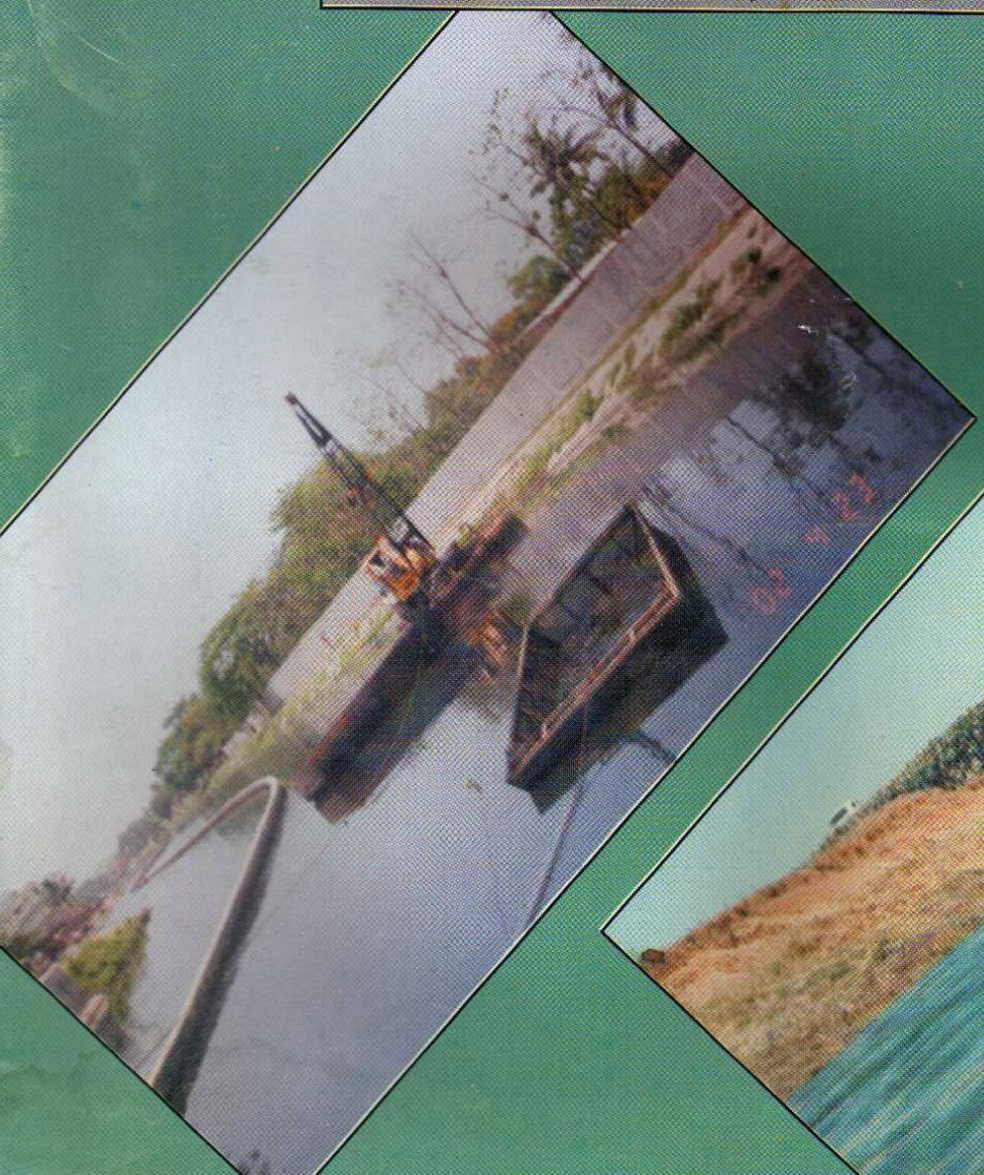

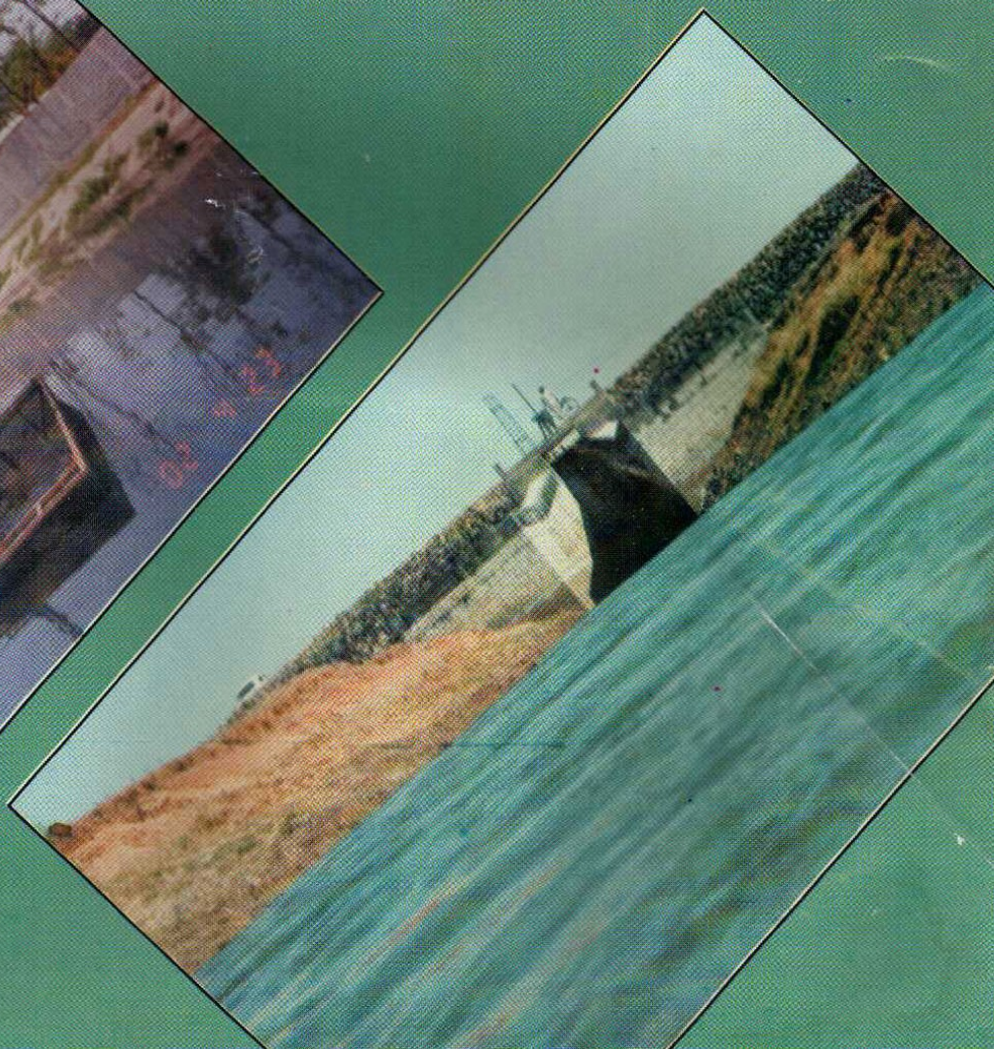

না, এসব করবেন না

* বাঁধের ঢাল কেটে বা বাঁধের উপরে ঘরবাড়ি বানালে বাঁধ আরও কমজোরি হয়ে যায়।
* বাঁধ কেটে মাটি নিলে যে কোনও সাধারণ ঝড়েই বাঁধ ভেঙে যাবে। এবং নোনা জল ঢুকে পড়বে চাষের জমিতে।
* বাঁধের ইট, বাঁশ বা বল্লা খুশিমতো তুলে নিলে অসুবিধেয় পড়বেন আপনি বা আপনারা। কাজেই এসব নয়।

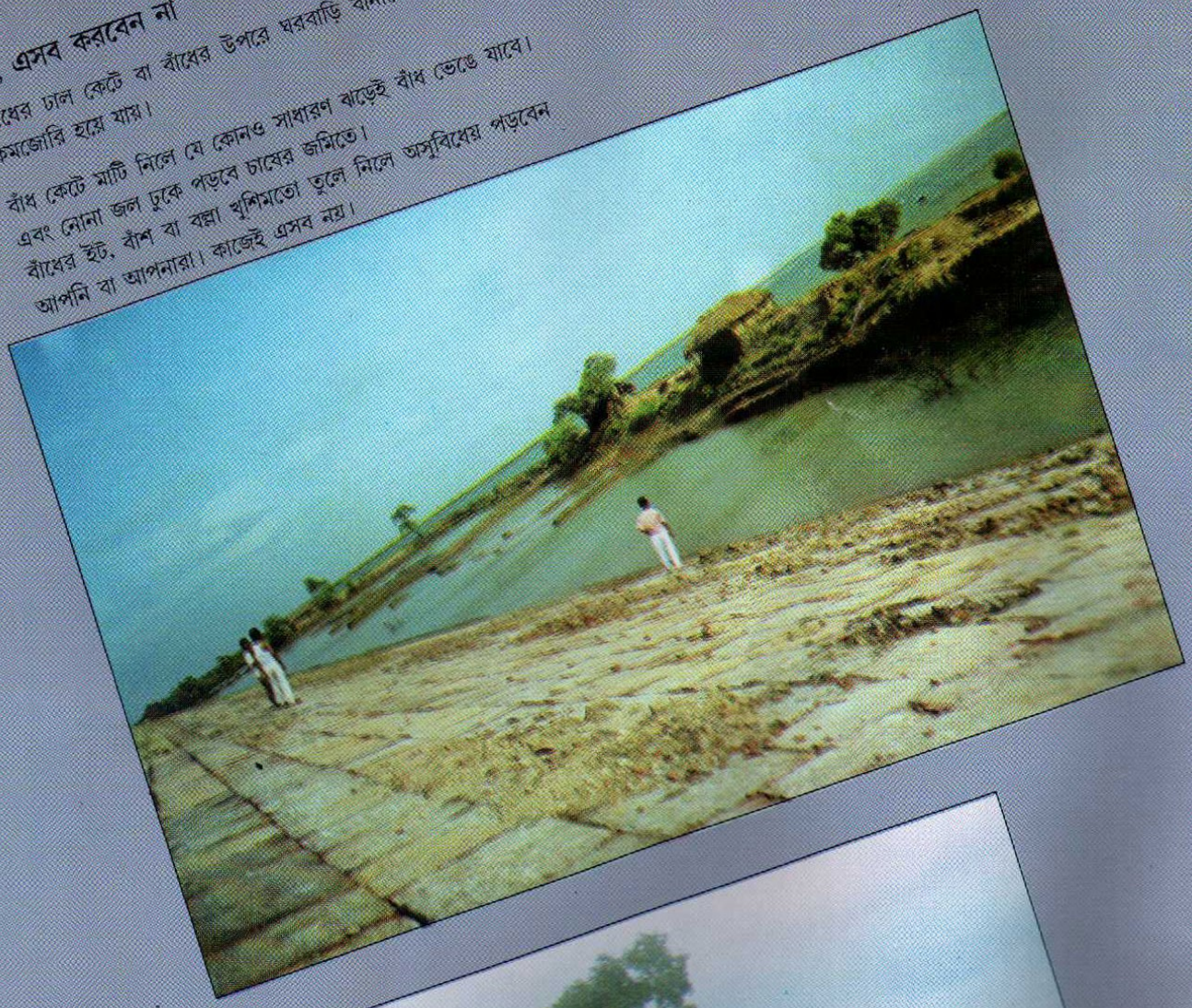

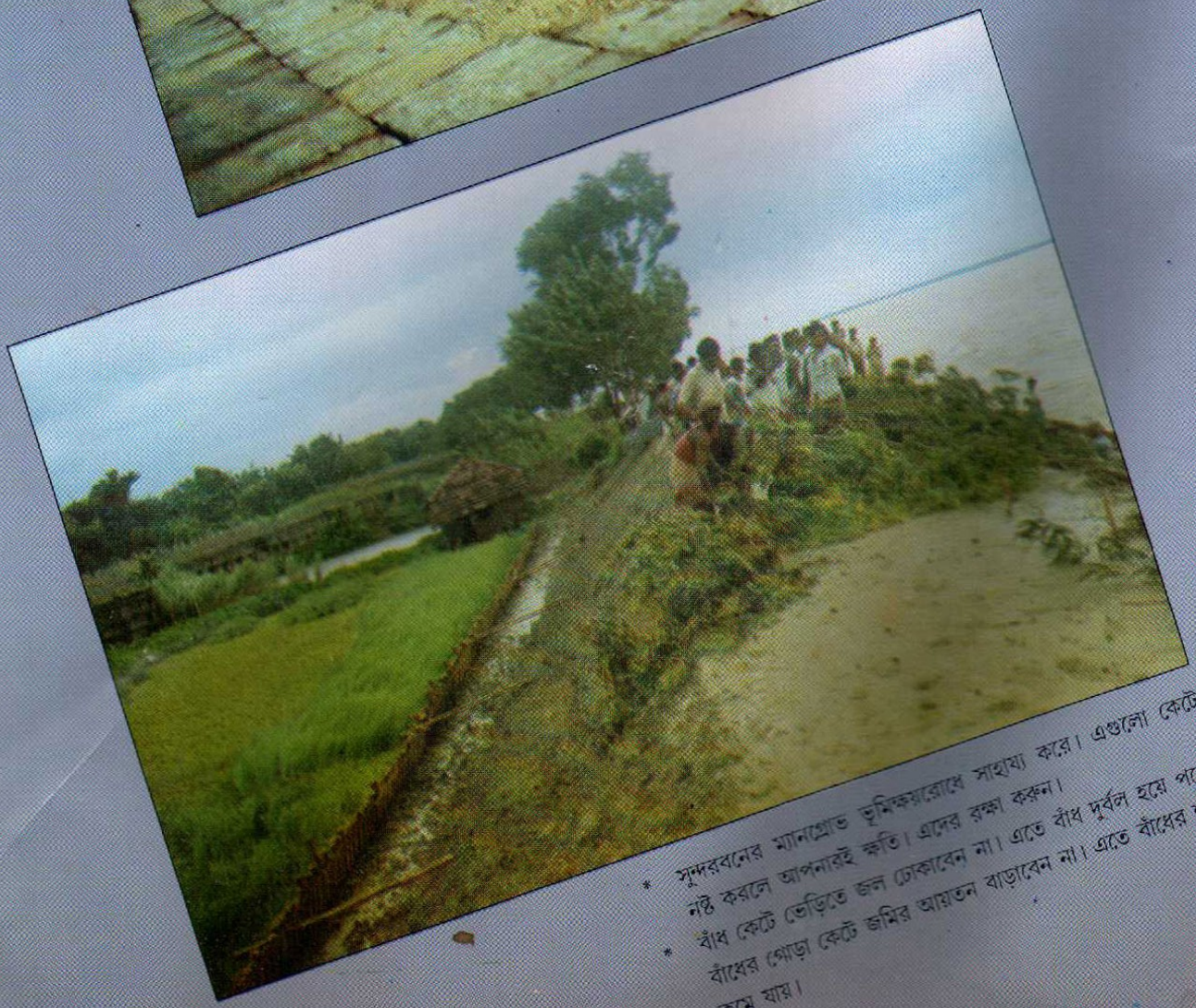

* সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ ভূমিক্ষয়রোধে সাহায্য করে। এগুলো কেটে নষ্ট করলে আপনারই ক্ষতি। এদের রক্ষা করুন।
* বাঁধ কেটে ভেড়িতে জল ঢোকাবেন না। এতে বাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ে। বাঁধের গোড়া কেটে জমির আয়তন বাড়াবেন না। এতে বাঁধের শক্তি কমে যায়।

সেচসেবক

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

দশম বর্ষ □ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি

অমলেন্দ্র লাল রায়

মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক

বিশ্বতোষ সরকার

মুখ্য বাস্তুকার-১

সংযুক্ত সম্পাদক

সমরেশ কুণ্ডু

নির্বাহী বাস্তুকার

রাজকাপুর শর্মা

সহ-বাস্তুকার

অজয় রায়

সহ-বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার

অবর সহ-বাস্তুকার

শচীন দাশ

পরিসংখ্যান ও প্রকাশন সহায়ক

জলসম্পদ ভবন

বিধাননগর, সল্টলেক

দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮

ফ্যাক্স : ০৩৩-৩৩৪-৬২৪৫/৩২১-৪৯২৮

ই-মেল : ce2iwd@cal3vsnl.net.in

ওয়েব সাইট : www.wbiwd.com

সেচমঞ্জরী

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৩
- পাঠকের কলম ৪
- নিম্নদামোদর নিকাশি প্রকল্পের থালিয়া-বাক্‌সি খালের ওপর নব নির্মিত সেতুর উদ্বোধন / সংবাদ ৫
- কলকাতা শহর ও শহরতলির জল নিষ্কাশন ও খালসমূহ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি / সংবাদ ৮
- কেষ্টপুর খালের পুনঃখনন অনুষ্ঠান / সংবাদ ১০
- তপসিয়ায় সুবারবর্ণ হেডকাট চ্যানেলের ওপর নির্মিত পাকা সেতুর উদ্বোধন / সংবাদ ১২
- কলকাতা শহর ও শহরতলির পাম্প-ড্রেনেজের কাজে সেচ দপ্তরের ভূমিকা : নির্মলকুমার উপাধ্যায়, অধিক্ষক বাস্তুকার ১৪
- পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ : পীযূষকান্তি বসু, প্রাক্তন সচিব / সেচ ও জলপথ বিভাগ ১৯
- নিকাশি ও বন্যাজনিত সমস্যায় জলপাইগুড়ি শহর : প্রদীপলাল ব্যানার্জি নির্বাহী বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩০
- হীরক জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্কালে—নদী বিজ্ঞান মন্দির : মানিক দে, উপ অধিকর্তা / নদী বিজ্ঞান মন্দির ৩৪
- জলসম্পদ সংরক্ষণে সচেতনতা : দিলীপ কর্মকার, অবর-সহ বাস্তুকার / সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩৭
- সংক্ষিপ্ত সংবাদ ৪০
  - কর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে সেচ দপ্তরের অফিস স্থানান্তর
    * নর্থ সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেল : বহরমপুর থেকে মালদহে
    * বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও অধীক্ষক বাস্তুকারের অফিস : পুরুলিয়া
  - সাবডিভিশনের অফিসের নাম পরিবর্তন
  - বন্যা নিরোধে বাঁধের কাজ
- বিশ্ববিচিত্রা / মুখ্য বাস্তুকার অঞ্জন দাশগুপ্ত সংকলিত ৪১
- সবুজায়নের পথে পুরুলিয়া ৪৩
- প্রচ্ছদ পরিচিতি
  - ১-ম প্রচ্ছদ (ওপর থেকে নীচে)
    * থালিয়া-বাক্‌সি খালের উপর নবনির্মিত সেতু
    * বাগজোলা খালে সংস্কারের কাজ চলছে
    * হনুমাতা সেচ প্রকল্প / পুরুলিয়া
  - ৪-র্থ প্রচ্ছদ
    * মালদহে গঙ্গা ভাঙনের নানা চিত্র

সম্পাদকীয়

'সেচপত্র' দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় কতগুলি জরুরি লেখার মধ্যে যেমন আছে কলকাতা শহর ও শহরতলির নিকাশিব্যবস্থার কথা, তেমনই আছে জলপাইগুড়ি শহরের নিকাশি ও বন্যাজনিত সমস্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ নিয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা; সঙ্গে পরিপূরক মানচিত্র ও ছবি। নদীবিজ্ঞান মন্দির এই দপ্তরের একটি বিশেষ বিভাগ। নদীর উন্নতিকল্পে ও নদী-জলের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কোনও পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কিনা তা জানার জন্য গভীর বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন এবং এই পরীক্ষার কাজটি এ দপ্তরের নদীবিজ্ঞান মন্দিরের কাজ। এসব নিয়ে, নদীবিজ্ঞান মন্দিরের হীরক জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে, এবারের সংখ্যায় একটি রচনা রাখা হয়েছে। এছাড়া আছে বিভাগীয় বিভিন্ন উন্নয়নমুখী সংবাদ ও প্রতিবেদন। তাছাড়া আছে বিভাগীয় অন্যান্য সংক্ষিপ্ত সংবাদ, বিশ্ববিচিত্রা ও নানা ধরনের তথ্য। আশা করি, বিগত অন্যান্য সংখ্যাগুলির মতো এবারের এই সংখ্যাটিও জনমানসে সমান রেখাপাত করবে।

পাঠকের কলম

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের বিভাগীয় পত্রিকাটি বহু দিন হল পাচ্ছি না। এই রকম তথ্যসম্পন্ন একটি পত্রিকা আমাদের খুব উপকারে লাগে, সংগ্রহ করার জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

নমস্কারান্তে—

ইতি

ভুবন চক্রবর্তী

শ্যামনগর, ২৪-পরগনা (উঃ)

সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের 'সেচপত্র' পত্রিকাটি লাইব্রেরিতে দেখলাম, অত্যন্ত সুন্দর ও তথ্যসমৃদ্ধ। পত্রিকাটি নেবার জন্য করণীয় কী জানালে ভালো হয়।

ধন্যবাদান্তে—

ইতি

অরবিন্দ নস্কর

হাসনাবাদ, ২৪-পরগনা (উঃ)

সম্পাদক সমীপেষু,

'সেচপত্র' পত্রিকা থেকে অনেক কিছু জানার থাকে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-এর নিরিখে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে অনেক তথ্য জানতে পারি। কিন্তু মাঝে মাঝে পত্রিকাটি পাই না। ধারাবাহিভাবে পাবার আশা রাখি।

ধন্যবাদান্তে—

ইতি

মানিকলাল রায়

বেলুড় বাজার, হাওড়া

সম্পাদক সমীপেষু,

সৌভাগ্যবশত দুই-একটি সংখ্যা সেচপত্র দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গের নদী, ড্রেনেজ বা চাষবাসে জলের জোগানো বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের পত্রিকা থেকেই জানতে পারি। এ বিষয়ে আমরা যারা এই বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত নই, তারাও অনেক কিছু তথ্য জানাতে পারি। কলকাতা ও তার আশেপাশের খালগুলির সম্বন্ধে আরও বিশদ লেখা আপনাদের পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে ভাল হয়।

নমস্কারান্তে—

ইতি

স্বপন পাল

সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগণা

নিম্ন-দামোদর নিকাশি প্রকল্পের থালিয়া-বাক্‌সি খালের ওপর
নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন

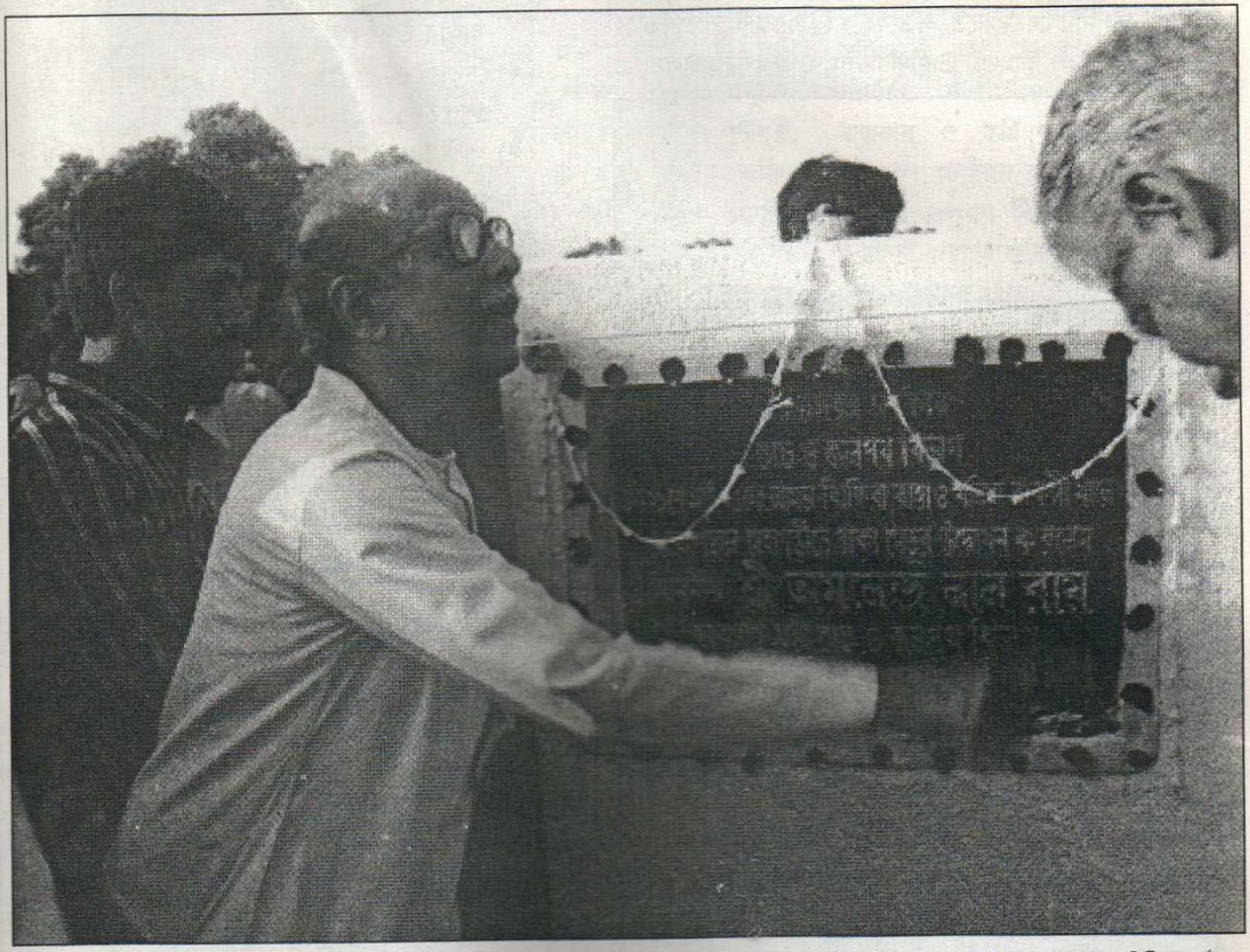

নিম্ন-দামোদর নিকাশি প্রকল্পের নবনির্মিত সেতুর উদ্বোধন করছেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অমলেন্দ্র লাল রায়। ছবি : দিলীপ কর্মকার

'দামোদর একটি আন্তঃরাজ্য নদী। আগে বৃহদাংশ ছিল বিহারের, এখন ঝাড়খণ্ডের।' কিন্তু ১৯৪৮ সালে আইন করে ভারত সরকার এটির দায়িত্ব তার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। কিন্তু কেন ? ভারতবর্ষের কোনো নদীরই তো দায়িত্ব এভাবে ভারত সরকার নেয়নি। তাহলে ? আসলে যারা হাওড়ার মানুষ, যারা হুগলির মানুষ, বা যারা বর্ধমানের মানুষ তাঁরা জানেন, দামোদর নদীর ভয়াবহতার কথা। তাঁরা জানেন, দামোদরের ভয়াবহ বন্যার কথা। একবার নয়, বারে বারে বন্যা এসে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এখানকার জনজীবন ও জনপদকে। দামোদরের এই ভয়াবহ বন্যার কথা বিবেচনা করেই তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দামোদর নদীর দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দামোদরকে নিয়ন্ত্রণ করা কোনো রাজ্য সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দামোদরের সমস্তরকম উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এখন থেকে ভারত সরকারের দায়িত্বে থাকবে। এর দায়িত্ব আমাদের। দামোদরের জলকে নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে যেমন হবে বন্যা প্রতিরোধ, সেচের কাজে এই জলকে লাগিয়ে যেমন হবে সবুজ বিপ্লব তেমনি আটকে রাখা এই জল থেকেই তৈরি হবে বিদ্যুৎ। ভালো কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কী দেখলাম। দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা অর্ধসমাপ্ত। যে ৮টি ড্যাম তৈরির কথা বলা হয়েছিল সেখানে তৈরি হল মাত্র চারটে। ফলে বাড়তি জল ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আর হচ্ছে বলেই বন্যায় মরছি আমরা।

"থলিয়া-বাক্‌সি (শর্টকাট) খাল প্রকল্প"

প্রস্তাবিত থলিয়া-বাকসি খালটি, নিম্ন-দামোদরের থালিয়া মৌজা (জেলা—হাওড়া) থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ ১১.৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, হাওড়া জেলারই বাক্‌সি নামক স্থানে রূপনারায়ণ নদীতে পড়বে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত হলে, আমতা, উদয়নারায়ণপুর, জয়পুর, খালসা ও

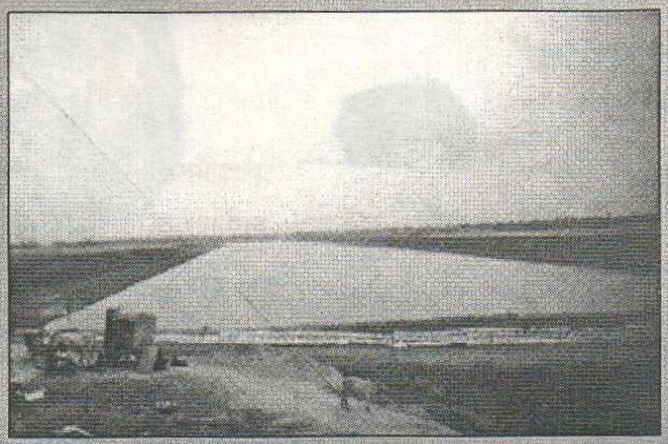

খালনা, জয়পুর-এ থলিয়া-বাক্‌সি শর্টকাট খালের চিত্ররূপ।

হুগলি জেলার বেশ কিছু অঞ্চল বন্যার প্লাবন থেকে, বিশেষ করে ডি ভি সি-র অতিরিক্ত জল ছাড়ার জন্য যে ধরনের বন্যা হয়, তার হাত থেকে রক্ষা পাবে। সাধারণত দেখা যায় যে, দামোদর উপত্যকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের দরুন ও ডি ভি সি জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার কারণে হাওড়া জেলার আমতা-উদয়নারায়ণপুর ও হুগলিতে প্রায় প্রতি বছর বন্যার সৃষ্টি হয়। ডি ভি সি থেকে যে পরিমাণ জল ছাড়া হয়, নিম্ন-দামোদরের নাব্যতা কম থাকার দরুন, নদী সেই পরিমাণ জল বহন করতে পারে না, ফলে বন্যা দেখা দেয়। থলিয়া-বাক্‌সি খালটি সেই অতিরিক্ত জল সরাসরি রূপনারায়ণ নদীতে ফেলবে। থলিয়া-বাক্‌সি খালটির জলপ্রবাহ ক্ষমতা ধরা হয়েছে ৩০,০০০ কিউসেক। খালটির তলদেশের প্রশস্ততা ৯১.৪৫ মি. এবং উপরিভাগের প্রশস্ততা ১৪৮ মি.। এছাড়া দুই পার্শ্বের ঢাল ১.৫ : ১ এবং বার্ম ১৬ মি. বাইরের ঢাল ২ : ১। দৈর্ঘ্য বরাবর ঢাল ০.২ মি./১০০০ মি. ও বাঁধ শীর্ষের প্রশস্ততা ৯.০ মি.। উক্ত থলিয়া-বাক্‌সি শর্টকাট খালের উপর তিনটি প্রধান নির্মাণ অবস্থিত। সেগুলি হল যথাক্রমে—

(১) দুই গাড়ি চলাচলের সড়ক সেতু।
   (ক) অবস্থান—সেহাগড়ি, থানা-জয়পুর, আমতা-ঝিকিরা রাস্তার উপর।
   (খ) সেতুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ—দৈর্ঘ্য ২৮৯ মিটার (৯৪৮ ফুট), প্রশস্ততা ১১.১৫ মিটার (ফুটপাথসহ)
   (গ) গাড়ি চলাচলের জায়গা—৭.৫০ মিটার (২৪-৮")

(২) রামপুর খলিয়া-বক্‌সি খালের আড়াআড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য জলসেতু
   (ক) অবস্থান—রামপুর খালের উপর
   (খ) মোট নির্মাণ দৈর্ঘ্য ২১৬.৮৬ মি.
   (গ) ফোকর ২ ভেন্ট (২.৪০ মি. X ২.৫০ মি.)

(৩) এক গাড়ি চলাচলের সেতু—
   (ক) অবস্থান—খালসা-জয়পুর রাস্তার উপর।
   (খ) সেতুর দৈর্ঘ ও প্রস্থ—দৈর্ঘ্য ১৮৩ মিটার, প্রস্থ ৭.২৫ মিটার (ফুটপাথ সহ) অ্যাপ্রোচ ছাড়া

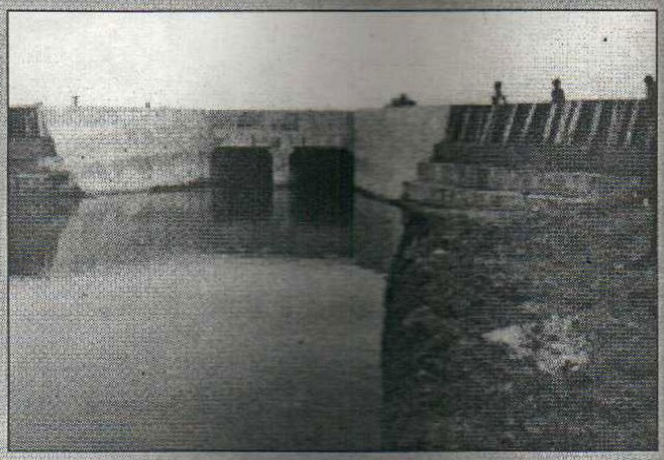

রামপুর খাল ও থালিয়া-বাক্‌সি শর্টকাট খালের উপর সাইফোন

উপরোক্ত তিনটি structure-এর কাজ এবং প্রস্তাবিত খালের প্রায় ৪.৫০ কিলোমিটার ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বাকি অংশের কাজ ত্বরান্বিতভাবে চলছে।

এবং উন্নয়নও মুখ থুবড়ে পড়েছে। যাই হোক রাজ্যে আমাদের ক্ষমতা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা কাজ করব। যেমন এই নিম্ন-দামোদর নিকাশি প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সেহাগড়ি সেতু তৈরি করেছি আমরা....'

গত ২৯ মার্চ ২০০৩ হাওড়া জেলার সেহাগড়িতে নিম্ন দামোদর নিকাশি প্রকল্পের থালিয়া-বাক্‌সি খালের ওপর নব-নির্মিত সেতুর উদ্বোধন করতে গিয়ে সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী অমলেন্দ্রলাল রায় এ কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন যে, '....আমাদের এই রাজ্যে অনেক নদী-নালা আছে। উপরন্তু সমুদ্রও প্রবাহিত আমাদের রাজ্যের একদিকে সীমানা ঘেঁষে। এবং মজার ব্যাপার হল এইসব নদীর অধিকাংশই আমাদে রাজ্যে এসেছে অন্য রাজ্য থেকে। এদে তাই বলা হয় আন্তঃরাজ্য নদী। তাহলে এই নদীর রক্ষণাবেক্ষণের একক দায়ি রাজ্য সরকারের হাতে থাকা উচিত নয়

আন্তঃরাজ্য নদী বলেই এর দায়িত্ব ভারত সরকারকেও নিতে হবে। কেননা আমরা নিচের প্রবাহে আছি। আর উপরের দিকে অন্য রাজ্য থেকে আসা নদীর জলের তৈরি হওয়ার সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছি আমরা। কাজেই তার দায়ভার আমাদের কেন একা নিতে হবে !'

সেচমন্ত্রী ছাড়াও এদিন বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান, আপনারা যে সেতু দেখছেন তা দামোদরের ওপর হয়নি। থলিয়া থেকে শুরু হয়ে সুদীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে বাক্সি পর্যন্ত খাল কেটে তা রূপনারায়ণে ফেলা হবে বন্যাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই এলাকার মানুষের বন্যায় ভয়ঙ্কর দুর্ভোগ। বর্ষা এলেই চরম আশঙ্কায় তাদের দিন গুণতে হয়। এই শর্টকার্ট খালটি তাদের সে আশঙ্কার হাত থেকে রক্ষা করবে। এ জন্য আমি সেচ বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলার উদয়নারায়পুরের বিধায়ক মাননীয় ননীগোপাল চৌধুরী, কল্যাণপুরের বিধায়ক মাননীয় অসিত মিত্র ও উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তাঁদের বক্তব্যে এই খাল কীভাবে ওই অঞ্চলের মানুষকে বন্যার হাত থেকে বাঁচাবে সে কথা উল্লেখ করেন। এঁরা ছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার প্রাক্তন বিধায়ক মাননীয় বারীন্দ্রনাথ কোলে, হাওড়া জেলার কৃষি ও সেচ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় রণেন ব্যানার্জি সহ সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিভিন্ন বাস্তুকার ও কর্মিবৃন্দ। কাজ সম্পাদনে ভারপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থা ম্যাকিনটোস বার্নের বাস্তুকার ও কর্মিবৃন্দ ছাড়াও আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানান সেচ ও জলপথ দপ্তরে মুখ্য বাস্তুকার/২।

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

ক)	*পত্রিকার নাম*	: সেচপত্র
খ)	*পত্রিকার ভাষা*	: বাংলা
গ)	*প্রকাশের স্থান*	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঘ)	*প্রকাশ কাল*	: ত্রৈমাসিক
ঙ)	*মুদ্রাকরের নাম*	: সোমনাথ আগরওয়ালা
চ)	*মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা*	: ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ছ)	*প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা*	: সোমনাথ আগরওয়ালা, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর কলকাতা—৭০০ ০৯১
জ)	*সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা*	: বিশ্বতোষ সরকার, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১
ঝ)	*স্বত্বাধিকারী*	: সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ঞ)	*স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা*	: জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা—৭০০ ০৯১

আমি, সোমনাথ আগরওয়ালা এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : সোমনাথ আগরওয়ালা

কলকাতা শহর ও শহরতলির জল নিষ্কাশন ও খালসমূহ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

উত্তর চব্বিশ পরগনার নোয়াই খালে মেশিনের সাহায্যে খাল-সংস্কারের কাজ চলছে।

বহু প্রতীক্ষিত কলকাতা শহর ও শহরতলীর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাল সংস্কারের কাজ বহুলাংশে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। সার্কুলার, বেলেঘাটা খাল, আপার বাগজোলা, লোয়ার বাগজোলা, বাগের খাল, ইছাপুর, নোয়াই, খড়দা খাল, ভাঙরকাটা, সুবার্বণ হেডকাট চ্যানেল, টাউন হেড-কাট চ্যানেল, ড্রাই ওয়েদার ও স্টর্ম ওয়েদার চ্যানেল, টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম চ্যানেল, ইন্টারসেপটিং চ্যানেল, ব্রাঞ্চ চ্যানেল (টি পি বেসিন), বেগর খাল ইত্যাদির প্রায় পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাজ, নিউ ও ওল্ড মণিখালি এবং চড়িয়াল খালের আংশিক কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে সেচ দপ্তর। এগুলি হাডকোর ঋণ সহায়তায় করা হয়েছে ও হচ্ছে। টালির নালার সংস্কার অনেকাংশে এগিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে কলকাতা মেট্রো রেলের কাজ চলাতে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। কয়েকটি খালের অংশ যেমন ক্যান্টনমেন্ট খাল, সোনাই খাল, উদয়পুর খাল, বড়োপীট খাল, ফতেশা খালের কাজের ভার হাডকোর ঋণ সহায়তায় স্থানীয় পৌরসভা বা পঞ্চায়েত সমিতিকে দেওয়া হয়েছে।

জনবহুল ভারতের গুরুত্বপূর্ণ শহর কলকাতার জল ও পয়ঃপ্রণালীর নিষ্কাশন সবসময়েই একটি স্থায়ী সমস্যা। সংলগ্ন প্রধান নদী হুগলি শহরের পশ্চিমদিকে হলেও ভূমির ঢাল প্রধানত পশ্চিম থেকে পূবে এবং ভূমি নিচু হওয়াতে সামান্য কিছু অঞ্চলের নিষ্কাশন হুগলিতে হলেও সিংহভাগ অঞ্চলের নিষ্কাশন বহুসংখ্যক খাল, স্লুইস, পাম্পের সাহায্যে শহরের পূর্ব দিকের হড়োয়া গাঙ, কুলটি গাঙ, বিদ্যাধরী নদীতে করতে হচ্ছে। অত্যধিক জনবসতির কারণে খাল-অঞ্চলের। অবৈধ-দখল, প্লাস্টিক নিক্ষেপ, কচুরিপানার জন্ম ও বৃদ্ধি, আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, খালগুলিকে সচল রাখার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পারিপার্শ্বিক নদীগুলি জোয়ারভাটায় প্রভাবিত হওয়ায় এটি আরও একটি বাধা। এই সঙ্গে খননজনিত পলি, আবর্জনা নিয়ে যাওয়া ও স্তূপীকৃত করার জমির অভাব তো রয়েছেই।

টালির নালা, বেলেঘাটা খাল, নিউ-কাট কেষ্টপুর খাল, নিম্ন বাগজোলা, টাউন-হেডকাট চ্যানেলের বামতীরে কিয়দংশ

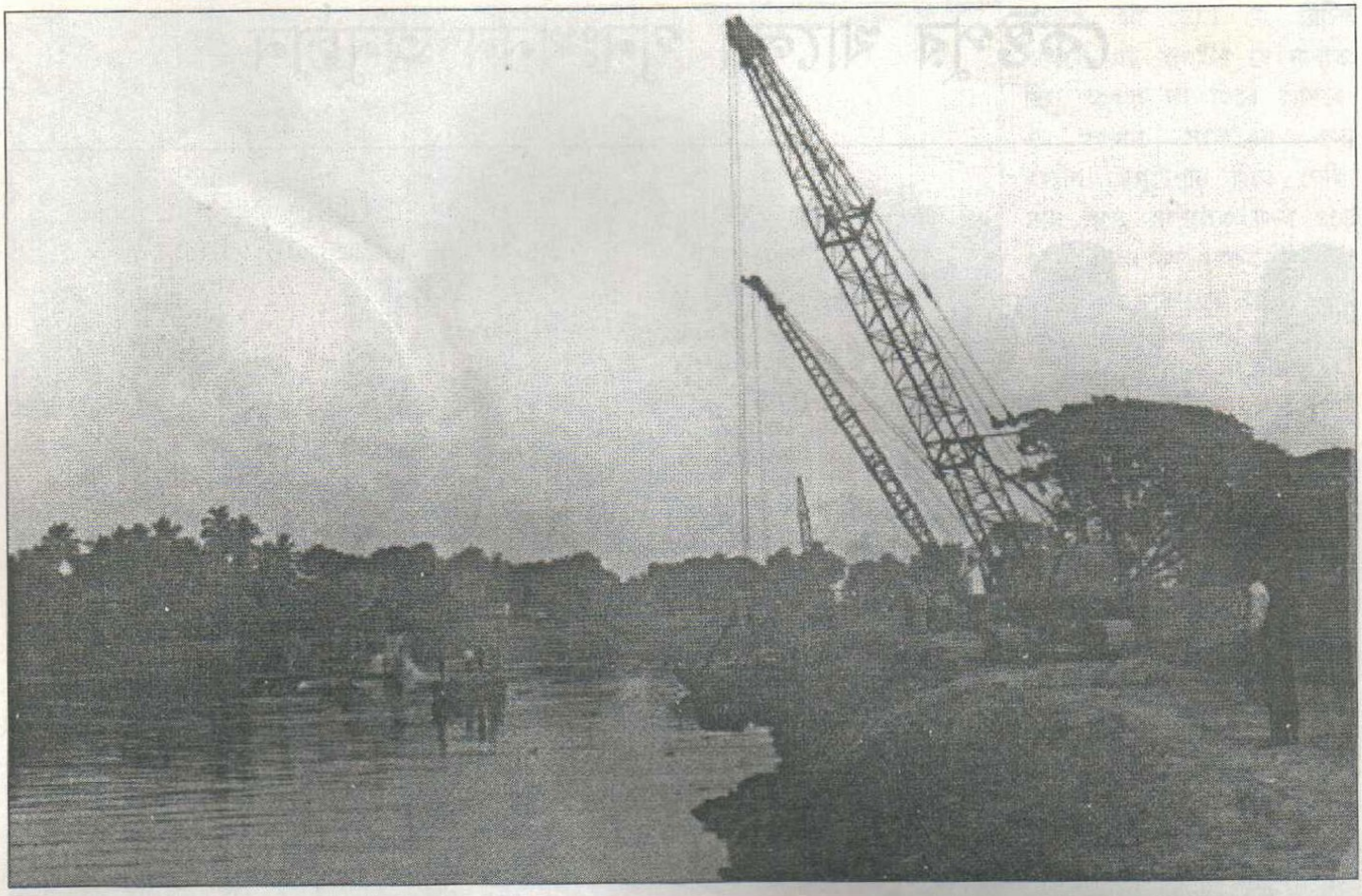

উত্তর চব্বিশ পরগনার নোয়াই খালে সংস্কারের কাজ চলছে।

দখলদার মুক্ত করে কাজ করা সম্ভব হয়েছে অবশ্যই স্থানীয় জনসাধারণ/জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সহায়তায়। কেষ্টপুর খাল সংস্কারের কাজ, নিউটাউন উন্নয়নে ভারপ্রাপ্ত সংস্থা হিডকো এবং সেচ ও জলপথ দপ্তর যুগ্মভাবে হাতে নিয়েছে। এই খালকে পুরোনো অবস্থায় এনে জলপথ হিসেবে উপযোগী করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৯৯ সালের পি এন রায় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত শেষ হওয়া কাজের জন্য কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে এবং সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত হলে কলকাতার জল ও পয়ঃপ্রণালীর নিষ্কাশনের সমস্যা বহুলাংশেই হ্রাস পাবে।

উক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কিছু সেতুর পরিসর বানানোর কাজ শেষ হয়েছে ও বাগজোলা খালের শেষপ্রান্তে নতুন পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের প্রারম্ভিক কাজও এগিয়ে চলেছে এবং সম্ভবপর স্থানে সবসময়ে সংস্কারের কাজ বজায় রাখার জন্য যন্ত্রচালিত খনন-সরঞ্জামেরও ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

এছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক ঋণ সহায়তায় কলকাতা কর্পোরেশন ও সেচ দপ্তর যুগ্মভাবে কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ হাতে নিয়েছে, যার প্রাথমিক কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এই কাজের সঙ্গে সেচ দপ্তরের বরাদ্দ কাজ চড়িয়াল ও মণিখালি খালের আউটফল পয়েন্টের দুটি বড় পাম্পিং স্টেশন ও চৌভাগা এবং কেওড়াপুকুরে দুটি বাড়তি পাম্পিং স্টেশন ও দক্ষিণ শহরতলীর বেশ কিছু খালের সংস্কার ও পাকা লাইনিঙের কাজ এবং কাজসমূহের ওপর প্রায় ৫৫টি সেতুর নির্মাণ।

উত্তর চব্বিশ পরগনার আপার বাগজোলা খালে পলি সরানোর কাজ চলছে।

কেষ্টপুর খালের পুনঃখনন অনুষ্ঠান

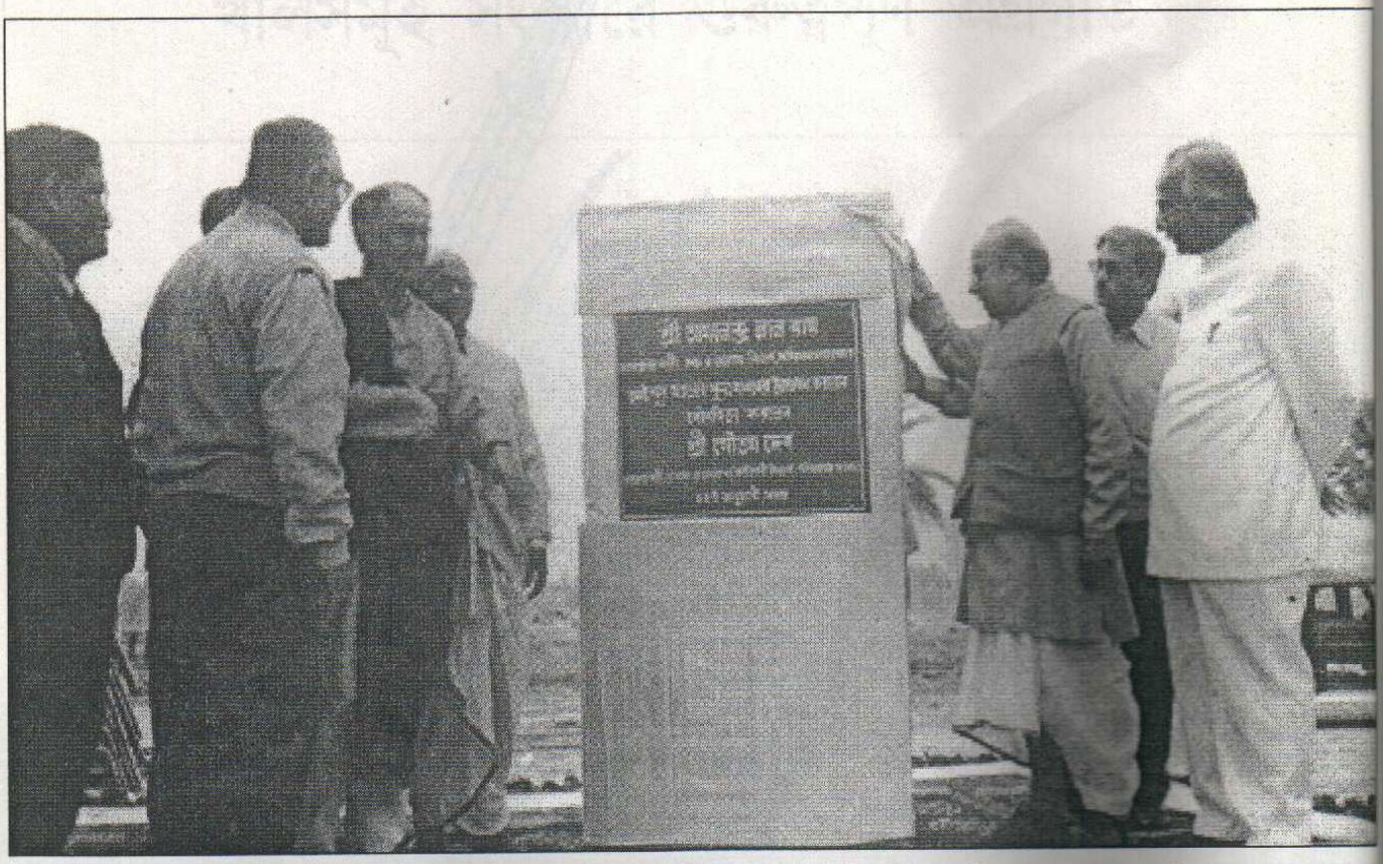

কেষ্টপুর খালের পুনঃ খনন অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিভাগের মন্ত্রী গৌতম দেব, সেচ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল, সেচমন্ত্রী অমলেন্দ্র লাল রায়-এর সঙ্গে বিধাননগর পৌরসভার পৌরপ্রধান দিলীপ গুপ্ত সহ, সেচ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার সুভাষচন্দ্র দে ও অধীক্ষক বাস্তুকার সাধনকুমার বিশ্বাস। *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

'আপনাদের মনে হতে পারে, হঠাৎ কেষ্টপুর খাল নিয়ে, খালের সংস্কার নিয়ে ঘটা করে এ-রকম একটা অনুষ্ঠান কেন করা হচ্ছে? ইতিপূর্বে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশের বেশিরভাগ খালেরই সংস্কারের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। সেগুলি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখানে এই খালটির সংস্কার উপলক্ষে আমরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি তার একটা কারণ আছে। কলকাতা ও শহরতলীর জীবনের সঙ্গে এক সময় এই খালের যেভাবে সংযোগ ছিল সেটার কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না। ভুলে যেতে পারি না যে এককালে এখানে এই খাল নিয়ে পরিষ্কার জল প্রবাহিত হত।' গত ১৬ জানুয়ারি ২০০৪ রাজারহাট নিউটাউনে, কেষ্টপুর খালের পুনঃখনন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাজ্যের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমলেন্দ্র লাল রায় এ-কথাগুলি বলেন।

তিনি বলেন, এককালে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের যোগাযোগে এই খালের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই খাল দিয়ে গঙ্গার জল ঢোকানো হত। ঢুকতো চিৎপুর লকগেট দিয়ে। আজ এতে আর জলের সেই প্রবাহ নেই। সংস্কারের অভাবে তা অনেকাংশে বুজে গেছে। কিন্তু আমরা নতুন করে এখন এই খালটা সংস্কারের ব্যবস্থা করছি। আবার যাতে এই খালে পরিষ্কার জল প্রবাহিত হয় সে ব্যবস্থাও আমরা করছি। এবং ৪০০/৫০০ কিউসেক জল এই খাল দিয়ে বহন করানো অসম্ভব কোনো ব্যাপারই নয়। তিনি জানান, জল যেমন প্রবাহিত হবে তেমনি প্রবাহিত এই জলের ধারায় জলযানও তেমনি চলবে। এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবে যেমন কলকাতা তেমনি উপকৃত হবে, গড়ে ওঠা নতুন এই উপনগরী রাজারহাট-নিউটাউন। কেননা যে কোনো শহর বা যে কোনো জনবসতিরই সম্পদ হল তার স্রোতস্বিনী নদী কিংবা প্রবাহিত জলসম্পদ। কাজেই সংস্কার পরবর্তী এ জলসম্পদই হবে রাজারহাট-নিউটাউনের গর্বের বিষয়। তিনি আরও বলেন দু-দুটো উপনগরী—বিধাননগর ও নিউটাউনের মাঝে এই খাল আগামীদিনে উন্নয়নের কাজে এক বিরাট ভূমিকা পালন করবে। তাই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান।

এদিনের অনুষ্ঠানে সেচ ও জলপথ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশ মণ্ডলও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, কলকাতা ও তার আশেপাশের খালগুলি কীভাবে সংস্কার করা যায় তার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ঠিক করা নীতি অনুযায়ীই সেচ দপ্তরের হাতে এ-সব খাল সংস্কারের কাজ আসে। এবং আপনারা জানেন সেচ দপ্তর ধাপে ধাপে সেসব কাজ করতে থাকে। জানি না, আমার অন্তত মনে পড়ে না ৫০-এর দশকে কখনো এভাবে খাল সংস্কার হয়েছে কিনা।

রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এই কেষ্টপুর খালের মাটি একদিকে যেমন কাটা হচ্ছে তেমনি সেই মাটি আবার ফেলা হচ্ছে এই নতুন নিউটাউন

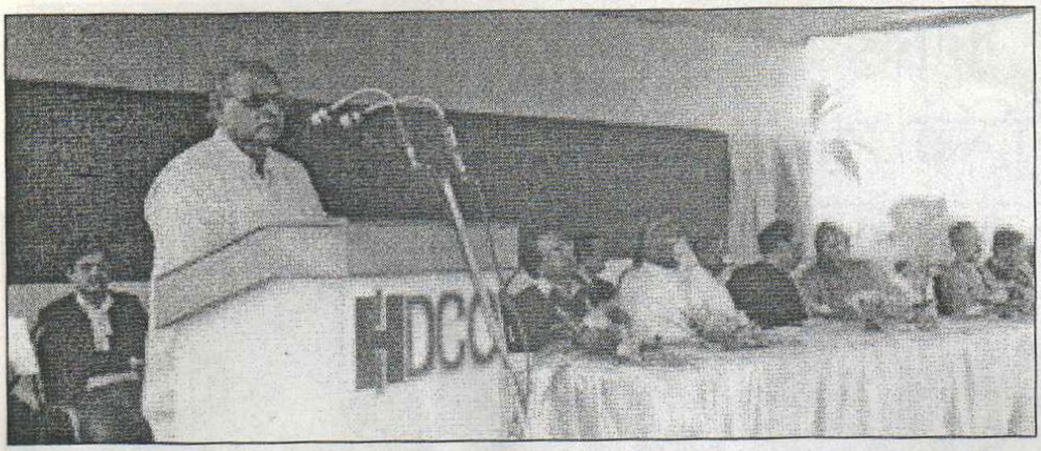

কেষ্টপুর খালের পুনঃ খনন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেচ রাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল। *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

উপনগরীর বুকে—যে উপনগরী হবে আগামী দিনে এ রাজ্যের গর্বের বিষয়। আর যে খাল এ উপনগরীর পাশ দিয়ে বইছে তা চলে যাবে তার বুক ভরা জল নিয়ে সেই সুন্দরবনের দিকে, সেও হবে এ রাজ্যের নতুন এক জলসম্পদ। তবে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, রাজ্য সরকার খাল কাটছেন ও খালের নাব্যতা বাড়িয়ে নানাভাবে খালের সৌন্দর্যায়ন করছেন, কিন্তু তার মানে এই নয় সরকার সবসময় খালপাড়ে দাঁড়িয়ে এই খালকে পাহারা দেবেন। এই পাহারার কাজ কিন্তু আপনাদেরই করতে হবে। খালের জলে যাতে নোংরা ফেলা না হয়, খালপাড় যাতে পরিষ্কার থাকে তা আপনাদেরই দেখতে হবে। আর খালপাড় পরিষ্কার না রাখলে তা থেকে যে পরিবেশ দূষণ ঘটবে তার হাত থেকে কিন্তু আপনারাও বাঁচবেন না।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে রাজ্যের আবাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেব জানান, এই শহরেই খানিকটা সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ খাল আছে। বাগজোলা। ওটা শেষ হয়েছে। কিন্তু তার জন্য সভা করার দরকার হয়নি। অথচ ৪০/৪১ কিলোমিটার একটা খাল কাটার ব্যাপারে এমন একটা অনুষ্ঠান কেন করলাম তা একটু বলি। আসলে আর পাঁচটা খালের সঙ্গে এই খালটা আমরা এক করে দেখছি না। এই খালটি নিয়ে আমরা একটা স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন দেখতে পয়সা লাগে না। আপনারা জানেন, সামনের বাগজোলা খাল যা করে, অর্থাৎ নোংরা জল বহন করে নিয়ে যাওয়া তা এই কেষ্টপুর খাল করে না। এই খালের দু-দিকে দুটো নদী আছে। বাঁদিকে হুগলি ডানদিকে বিদ্যাধরী। গঙ্গা দিয়ে মিষ্টি জল ঢুকিয়ে তা বিদ্যাধরী দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। ফলে দীর্ঘ এই খালপথে যদি জলযান চালানো যায় তাহলে রাজারহাট-নিউটাউন থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একটা পর্যটন ব্যবস্থাও শুরু করা যায়। আর আমরা তা করব। আমরা এই খালের পাড় বাঁধাবো, খালের পাড়ে আলোর ব্যবস্থা করব এবং দু-ধারে সুন্দর রাস্তাও করে দেব। যদিও খাল কাটা সেচ দপ্তরেরই কাজ তবু কাজের সুবিধার্থে আমরা এই খালের কুড়ি কিলোমিটারের একটা হিডকো-কে দিয়েই শুরু করাচ্ছি।

বিধাননগর পৌরসভার পৌরপ্রধান দিলীপ গুপ্ত মহাশয়ও এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, কী যে ভালো লাগছে সেকথা বলে বোঝানো যাবে না। ভালো লাগছে এই ভেবে যে, ব্রিটিশ আমলে এই খালটির যে নাব্যতা ছিল আবার তা ফিরে আসবে। এ খালের সংস্কারের জন্য বহুদিন ডেপুটেশান দিতে গেছি। মনে পড়ে, সল্টলেক যখন গড়ে ওঠে তখনও ঠিক এরকম ছিল। এই খাল দিয়ে কাঠ যেত বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) বরিশালে। আবার ওখান থেকে ধান ও চাল আসতো। চীনে গিয়ে দেখেছি, ওখানে এ ধরনের জলপথকে পরিবহনের কাজে লাগানো হচ্ছে। এখানেও আগামীদিনে যে এমন কিছু ঘটতে চলেছে তা ভেবে আনন্দিত হচ্ছি। শুধু একটা কথা, এ খাল যেন আবার নোংরা হয়ে না যায়। আর তার জন্য দেখভালের কাজ শুধু সরকার করতে পারে না। সরকারের পাশাপাশি আপনাদেরও এ-ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে এদিনে কৃষ্ণপুর খালের পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধীক্ষক বাস্তুকার সাধন বিশ্বাস বলেন, উত্তর-পূর্ব কলকাতা, বিধাননগর পৌরসভার কিয়দংশ এবং রাজারহাট পঞ্চায়েত সমিতির মানুষজন এতে উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব বিশ্বরঞ্জন দাশ মহাশয় ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হিডকোর ইঞ্জিনীয়ারিং ইন চীফ সুবোধ ভট্টাচার্য মহাশয়।

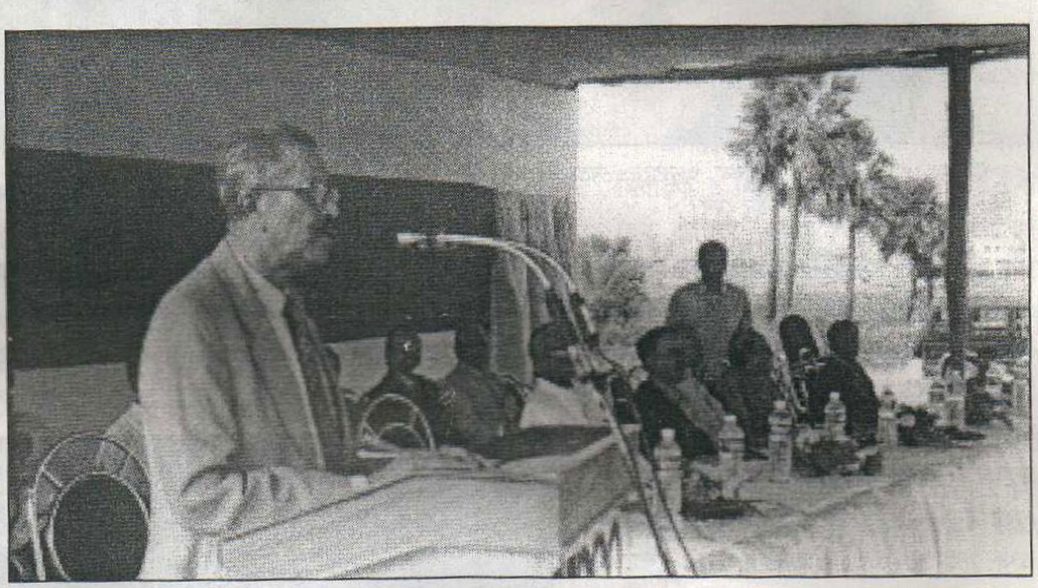

কেষ্টপুর খালের পুনঃ খনন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেচ সচিব বিশ্বরঞ্জন দাশ। *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

তপসিয়ায় সুবারবর্ণ হেডকাট চ্যানেলের ওপর নির্মিত পাকা সেতুর উদ্বোধন

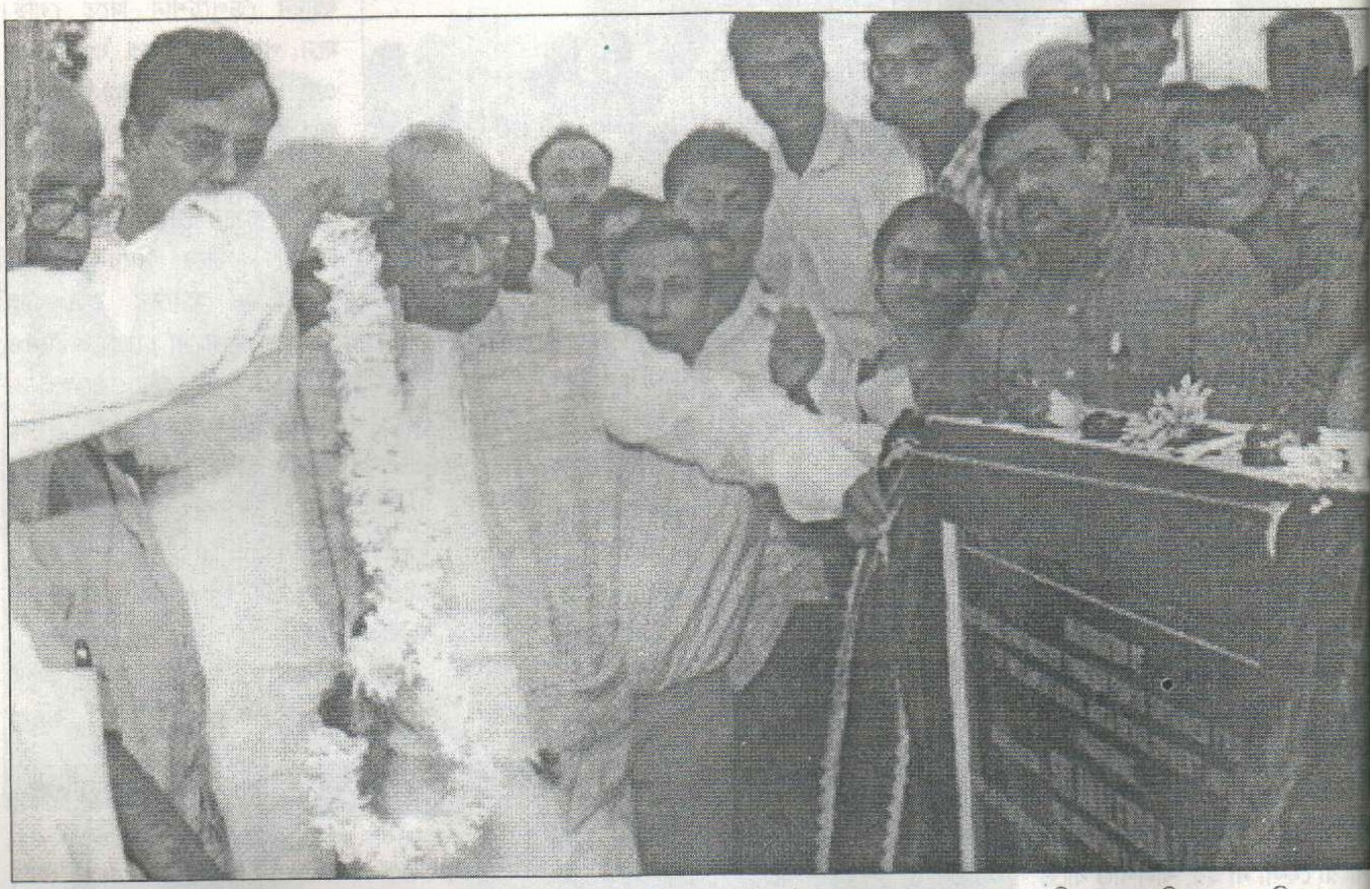

তপসিয়ায় পাকা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সেচমন্ত্রী অমলেন্দ্র লাল রায়, সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহঃ সেলিম, এবং বিধায়ক ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক রবীন দেব।

ছবি : দিলীপ কর্মকার

'এই যে সেতুটি, এখানে যে খালের ওপর তৈরি হয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার সবচেয়ে পুরনো ও বড় খালের মধ্যে এটি অন্যতম। দীর্ঘকাল ধরে নোংরা জমে জমে এই সব খাল এখন নোংরা জলের খালে পরিণত হয়েছে। অথচ একসময় এখানে তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার জল প্রবাহিত হত। এমনকি কোনও কোনও খাল দিয়ে নৌকাটৌকা চলত। কিন্তু এরপরে যত নোংরা ফেলার জায়গা হয়েছে এই সব খাল। আমরা তাই ভেবেছি কলকাতা ও তার আশপাশের সমস্ত খালের সংস্কারের কথা। কিন্তু ভাবলেই তো হবে না, তার জন্য টাকা চাই। অথচ এত টাকা আসবে কোত্থেকে ! এদিকে আর ফেলেও তো রাখা যায় না। তাই ধার করে আমরা এগুলির সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছি।'

গত ২০ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার তপসিয়ার সুবারবর্ণ হেডকাট চ্যানেলের ১৬ নং চেইনে নির্মিত একটি পাকা সেতুর উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অমলেন্দ্রলাল রায় মহাশয় এ কথা বলেন। তিনি জানান, গত ৪/৫ বছর ধরে এই সংস্কারের কাজ চলছে তবে এটাই এই তরফে এদিকে শে সংস্কারের কাজ। এরপর তা চলবে দক্ষিণ পূর্ব কলকাতার দিকে। কিন্তু খাল যেম

তপসিয়ায় পাকা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার/১ বিশ্বতোষ সরকার

ছবি : দিলীপ কর্মকার

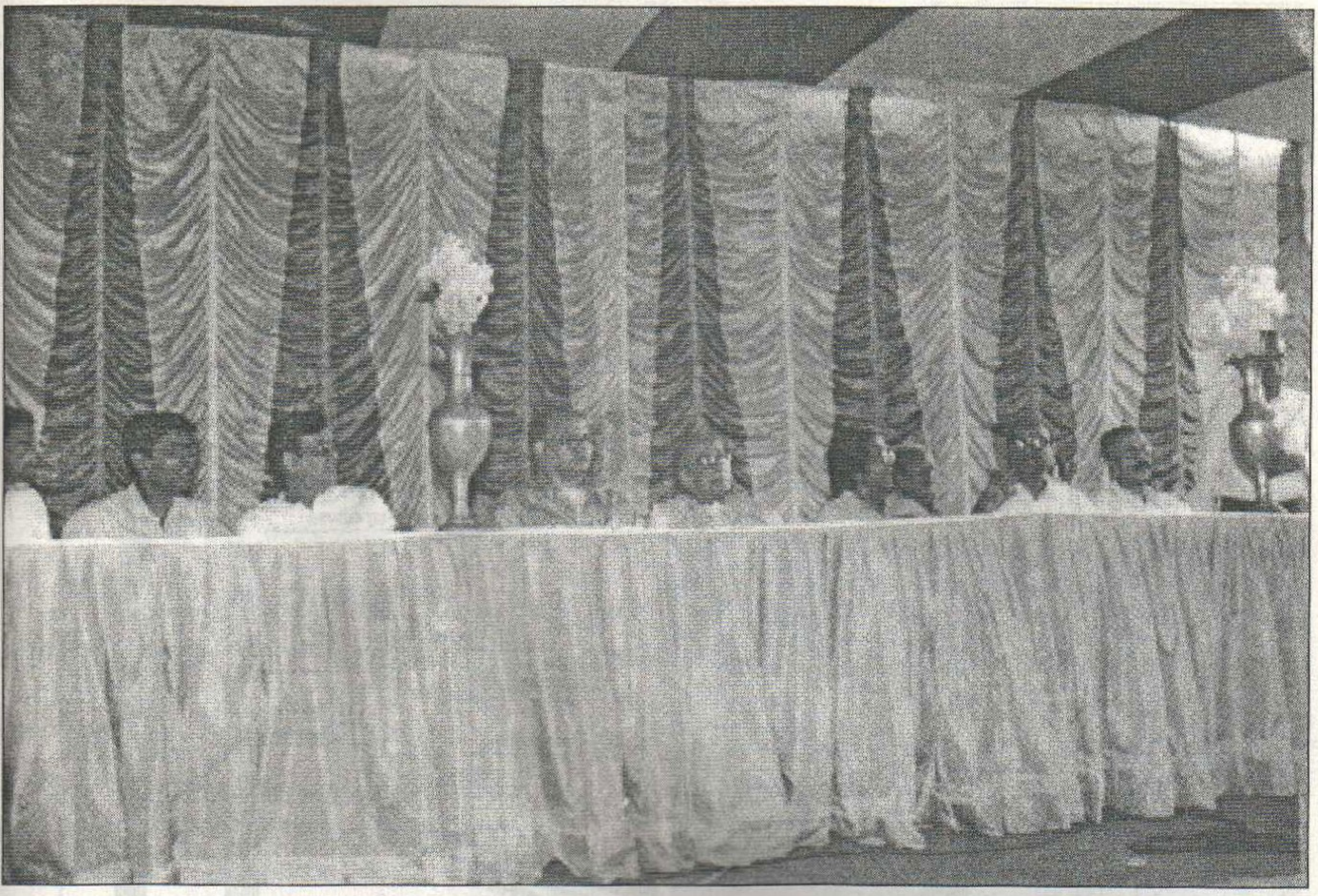

তপসিয়ায় পাকা সেতুর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে স্থানীয় কাউন্সিলার সহ মন্ত্রী মহঃ সেলিম, বিধায়ক রবীন দেব, সেচমন্ত্রী অমলেন্দ্র লাল রায়, সাংসদ বিপ্লব দাশগুপ্ত ও সেচসচিব বিশ্বরঞ্জন দাশ।

ছবি : দিলীপ কর্মকার

সংস্কার হচ্ছে তেমনই খালের ওপর দিয়ে যাতায়াতের জন্যও তৈরি হচ্ছে পাকা সেতু, যাতে মানুষ থেকে যানবাহন সবাই চলাচল করতে পারে। তা এরকমই এই পাকা সেতুটি তৈরি করা কিন্তু রাজ্য সরকারের একার চেষ্টায় হয়নি। এই সেতু তৈরির খরচের কিছু অংশ বহন করেছেন এ রাজ্যের তিন সাংসদ তাদের সাংসদ তহবিলের টাকায়। এই তিন সাংসদ হলেন ড. অশোক মিত্র, ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং রাজ্যের তৎকালীন সাংসদ ও বর্তমান মন্ত্রী মহঃ সেলিম। আমরা সেচ দপ্তর রাজ্য সরকারের পক্ষে এই সেতুটি তৈরি করতে পেরে আনন্দিত এবং আরও আনন্দিত যে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আমরা তা করতে পেরেছি।

শারীরিক অসুস্থতা নিয়েও সভায় এদিন হাজির থাকলেও কোনও বক্তব্য রাখতে পারেননি ড. বিপ্লব দাশগুপ্ত। রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ, যুবকল্যাণ ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও তৎকালীন সাংসদ মহঃ সেলিম বলেন, কলকাতার পরিধি ক্রমশই বাড়ছে। আগে কলকাতা বুঝতে কেবল ধর্মতলা ও পার্ক স্ট্রিট মনে করা হত। কিন্তু ওদিকে সল্টলেক হয়েছে নিউ টাউন হয়েছে। আবার এদিকে গড়িয়া ছুঁয়ে আরও দক্ষিণেও কলকাতা বড় হচ্ছে। হুগলির ওপর বিদ্যাসাগর সেতু পূর্বে হাওড়ার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এপারে কলকাতার ফ্লাইওভার হয়েছে/হচ্ছে, রাস্তা চওড়া হচ্ছে। পার্ক স্ট্রিট ও ইস্টার্ন বাইপাশ কনেক্টর আরও চওড়া হচ্ছে। ইস্টার্ন বাইপাশ তো চওড়া হচ্ছেই। কাজেই নতুন ও পুরনো কলকাতার মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। এই লক্ষ্যে এই সেতু যাতে এপারের পুরনো কলকাতার মানুষ সেতু পেরিয়ে বাইপাশে গিয়ে নতুন নতুন এগিয়ে যাওয়া কলকাতার সঙ্গে মিলন মেলায় সামিল হতে পারে। এ ছাড়া যানজটের সমস্যা এই তপসিয়ার একটা বড় সমস্যা। কেননা গাড়ি বাড়ছে, মানুষজনের কাজের পরিধি বাড়ছে যানজটও হচ্ছে বেশি। এদিকে লক্ষ্য রেখেই এই সেতু নির্মাণ।

এদিনের সভায় উপস্থিত থেকে স্থানীয় বিধায়ক ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক রবীন দেব জানান, ২০০ সালের ১৩ এপ্রিলের একটু আগে এই খালের ওপরই অপর একটি সেতুর উদ্বোধন করেছিলাম আমরা সেচ দপ্তরের সঙ্গে এবং সেইদিনই ঘোষণা করেছিলাম, এখানে এই কোহিনূর সেতুটিও আমরা চওড়া করব। আমরা তা করেছি। সেচ দপ্তর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তা শেষ করেছেন। সেজন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই।

সেতু উদ্বোধনীর এ অনুষ্ঠানে এদিন স্বাগত ভাষণ রাখেন, সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব বিশ্বরঞ্জন দাশ মহাশয় ও সবাইকে ধন্যবাদ জানান সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্যবাস্তুকার/১ বিশ্বতোষ সরকার মহাশয়।

ছোট্ট অথচ জনবহুল এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার ও সেচ দপ্তরের বিভিন্ন বাস্তুকার আধিকারিক ও কর্মিবৃন্দ।

কলকাতা শহর ও শহরতলির পাম্প-ড্রেনেজের কাজে সেচ দপ্তরের ভূমিকা

নির্মলকুমার উপাধ্যায়

কোলকাতার ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন সমূহ

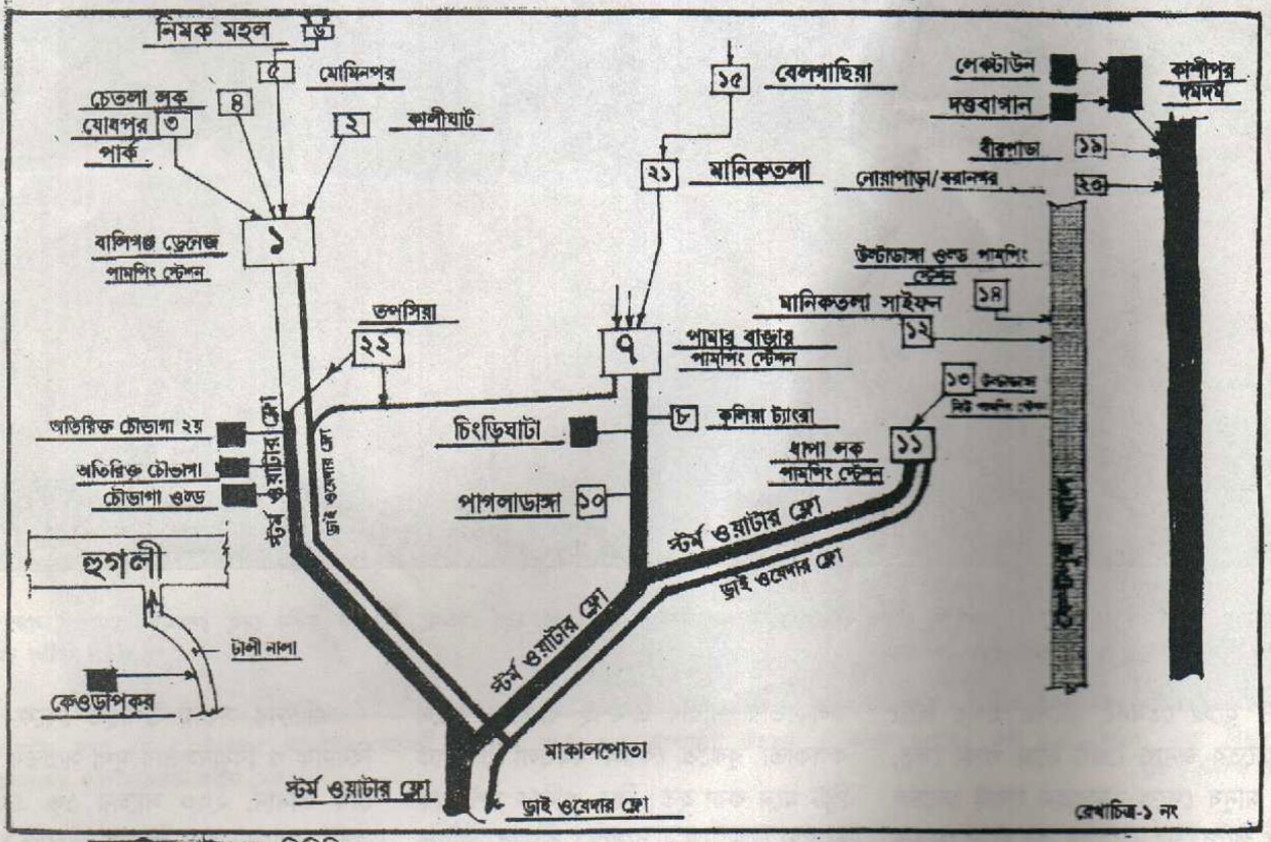

পাম্পিং স্টেশন পরিচিতি

কোলকাতা পুরসভার	☐	সি. এম. ডব্লিউ. এস. এ.' র	■
সেচ বিভাগের	■	কে. এম. ডি. এ' র	▦
জনস্বাস্থ্য বিভাগের	■		

হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে শহর কলকাতা। এই নদীই কলকাতা শহরের প্রাণ স্পন্দনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর এই নদীর জল যাতে শহরের ময়লা নর্দমার জল দ্বারা কলুষিত না হয় সেদিকে যতটা সম্ভব নজর রেখেই এখানকার জল নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। শহরের ড্রেনেজের জলের বেশিরভাগই খালপথে শহরে পূর্বদিকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বিদ্যাধরী নদীতে ফেলা হয়। শহরের ভূমিভাগের ঢালও হুগলি নদীর পাড়ের দিক থেকে ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস ও সল্ট লেকের দিকে হওয়ায় এইরূপ নিকাশি ব্যবস্থার পক্ষে সহায়ক হয়েছে।

শহর কলকাতার পাম্প ড্রেনেজ ব্যবস্থার কাজে মুখ্য ভূমিকা রয়েছে কলকাতা পুরসভার। এছাড়া এই কাজে সেচ দপ্তর, কে এম ডি এ, সি এম ডব্লিউ এস এ এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগেরও ভূমিকা রয়েছে।

কলকাতা পুরসভার অন্তর্গত পাম্পিং স্টেশন :

কলকাতা পুরসভার অধীনে বালিগঞ্জ ড্রেনেজ, পামারবাজার ও ধাপালক নামে তিনটি প্রধান পাম্পিং স্টেশন এবং নিমক মহল, মোমিনপুর, চেতলা, কালীঘাট, যোধপুর পার্ক, কুলিয়া ট্যাংরা, পাগলাডাঙা, ঠনঠনিয়া, মানিকতলা, ড্রেনেজ, মানিকতলা সাইফন, তোপসিয়া, নিউ উল্টাডাঙা ড্রেনেজ, উল্টাডাঙা সাইফন, বেলগাছিয়া, বীরপাড়া নামে আরও ১৫টি ছোটো ও মাঝারি মাপের পাম্পিং স্টেশন আছে। সাধারণভাবে বলা যায়, দক্ষিণ কলকাতার অন্তর্গত খিদিরপুর, মোমিনপুর, চেতলা, কালীঘাট, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, পদ্মপুকুর রোড, দিলখুসা স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, যোধপুর পার্কের জল, বালিগঞ্জ ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন দিয়ে নিকাশি হয়। মধ্য ও উত্তর কলকাতা অঞ্চলের জল (মানিকতলা, উল্টাডাঙা অঞ্চল বাদ দিয়ে) বার করা হয় পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন দিয়ে আর

মানিকতলা, উল্টাডাঙা অঞ্চলের জল নিকাশি হয় ধাপালক পাম্পিং স্টেশন দিয়ে (জল নিকাশের দায়িত্ব ধাপালক পাম্পিং স্টেশনের)।

অন্যান্য ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন :

কলকাতা পুরসভা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের অন্তর্গত ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনগুলি হল :

(১) সেচ বিভাগের চৌভাগার ৩টি এবং ক্যাওড়াপুকুরের ১টি বড় পাম্পিং স্টেশন।

(২) জনস্বাস্থ্য বিভাগের দত্তবাগান, লেকটাউন এবং কাশীপুর/দমদম পাম্পিং স্টেশন।

(৩) সি এম. উব্লিউ. এস. এ.-র চিংড়িঘাটা পাম্পিং স্টেশন।

(৪) কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির নোয়াপাড়া/বরানগর নামে একটি বড় পাম্পিং স্টেশন এবং গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে নির্মিত কয়েকটি ছোটো ছোটো পাম্পিং স্টেশন।

কলকাতা শহর ও শহরতলির পাম্প ড্রেনেজের বিষয়ে সেচ দপ্তরের ভূমিকা এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তার আগে শহর কলকাতার ড্রেনেজ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত পাম্পিং স্টেশনগুলির জল প্রেরণ ব্যবস্থা পদ্ধতি-১ নং চিত্র দ্বারা দেখানো হল।

পাম্প ড্রেনেজ ব্যবস্থায় সেচ দপ্তরের ভূমিকা

সেচ দপ্তরের অধীন চৌভাগার ৩টি এবং ক্যাওড়াপুকুরে ১টি বড়ো ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন আছে। এছাড়া গত বছর থেকে বর্ষার সময় কুঁদঘাট, লেকটাউন, খড়দহ প্রভৃতি কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে বিদ্যুৎচালিত ২.৫ থেকে ৫ কিউসেক ক্ষমতাবিশিষ্ট ছোটো পাম্প চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার সোনারপুর, দক্ষিণ গড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলের জল উত্তরভাগে অবস্থিত দুটি পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে নিকাশ করা হয়।

চৌভাগার পাম্পিং স্টেশন

টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম বেসিনের অন্তর্গত কসবা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, সন্তোষপুর, গড়িয়ার কিছু অঞ্চলের জল নিকাশের জন্য স্বাভাবিক জল নিকাশী ব্যবস্থার পাশাপাশি চৌভাগায় তিনটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। এই তিনটি পাম্পিং স্টেশনে মোট ২৯টি পাম্প বসানো আছে। বর্ষার সময় এই পাম্পগুলি বেশি চালাতে হয়। তখন প্রয়োজনে এগুলির মধ্যে ২১ থেকে ২৩টি পাম্প একটানা ৫-৭ দিন পর্যন্ত চালানো হয়। বর্ষা ছাড়া অন্য সময়ে রোজ ১ থেকে ৪টি পাম্প ৭/৮ ঘণ্টার জন্য চালাতে হয়। বর্ষার সময় এখানকার পাম্পগুলি সেবিত এলাকা থেকে দৈনিক প্রায় ৭০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাতের জল নিকাশ করতে সক্ষম। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ তার থেকে বেশি হলে সেই জল নিকাশ করতে আনুপাতিক হারে বেশি সময় লাগে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, ১৯৯৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যখন তিনদিনে প্রায় ৪০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় তখন সেই জল নিকাশ করতে পাঁচদিনের বেশি সময় লগেছিল।

এখানকার পাম্পিং স্টেশনের সমস্যা :

(ক) **জলবাহিত আবর্জনার সমস্যা**—বিভিন্ন শাখা খাল থেকে, টালিগঞ্জ পঞ্চান্নগ্রাম মেইন ক্যানাল ও ইন্টারসেপ্টিং চ্যানেল মারফৎ এই পাম্পগুলিতে জল আসে। এই সব খালের ধারে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে এবং সেখানকার জনসাধারণ অনেক সময় এই খালগুলিকে বাড়ির জঞ্জাল ফেলার সোজা জায়গা হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই এই পাম্পিং স্টেশনগুলির মুখে প্লাস্টিকের ব্যাগ, ছেঁড়া বস্তা, ডাবের খোলা, মোটর সাইকেল-স্কুটারের টায়ার, পশুপাখির শব ইত্যাদি সোজাসুজি এসে হাজির হয়। এই সব বর্জ্য পদার্থ পাম্পের ভিতর ঢুকে, জড়িয়ে পাম্প বন্ধ করে দেয়। পাম্পের জলের প্রবেশ পথ থেকে এইসব আবর্জনাকে প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করা একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) **এলাকায় ঘনবসতি গড়ে ওঠার সমস্যা**—টালিগঞ্জ-পঞ্চান্নগ্রাম বেসিন এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে প্রায় মাঠের লেভেলেই ক্রমাগত বাড়িঘর নির্মিত হয়ে চলেছে এবং সেখানে পরিকল্পিত

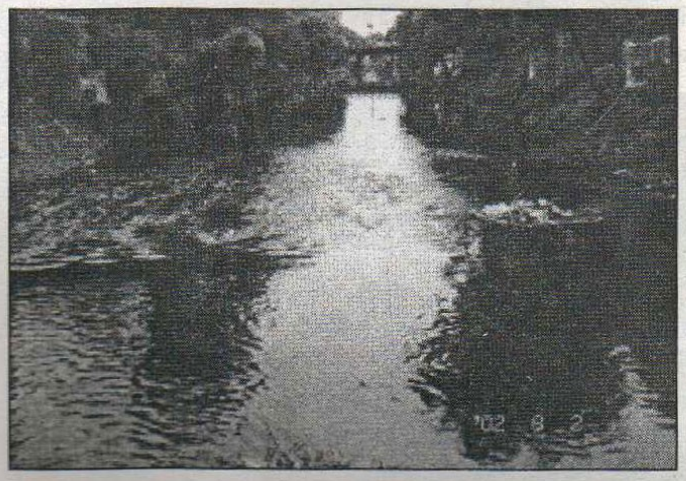

খালে থেকে যাওয়া ক্রশবাঁধের বাধা দূর করতে পারলে নিকাশী ব্যবস্থা আরও ভাল হতে পারে।

ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাব থাকছে ; ফলে বেশি বৃষ্টি হলে এই সব এলাকার জল ঠিকমতো নিকাশ হওয়ার পথে সমস্যা বাড়তেই থাকবে।

(গ) **খালে ক্রশবাঁধের সমস্যা**—খালে ক্রশ বাঁধ জল নিষ্ক্রমণের পথে একটা বাধা। যন্ত্রের সাহায্যে এইসব বাঁধের মাটি সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করলে জল নিকাশি ব্যবস্থা আরও ফলপ্রসূ হবে।

ক্যাওড়াপুকুর পাম্পিং স্টেশন :

ক্যাওড়াপুকুরে ৪টি পাম্প বসানো আছে। বর্ষাকালে সাধারণভাবে এই পাম্পগুলির মধ্যে ৩টিকে একটানা চালানো হয়। ক্যাওড়াপুকুর ড্রেনেজ বেসিনে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে। তাই এই এলাকার জন্য এখন আরও বেশি পাম্প চালানোর দরকার হয়ে পড়ছে এবং এখানে আরও কিছু পাম্প বসানোর বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

সমস্যাসমূহ :

(ক) *পাম্পসংলগ্ন ইনটেক খালের সমস্যা*—এই পাম্পহাউস সংলগ্ন ইনটেক খাল একসঙ্গে সব পাম্পগুলিকে সাধারণ অবস্থায় সমানভাবে জল সরবরাহ করতে পারে না। তবে খুব বর্ষার সময়ে এর তিনটি পাম্প চালাতে অসুবিধা হয় না।

(খ) *জোয়ারের সময় পাম্প চালানোর অসুবিধা*—এখানকার পাম্পগুলির জল পাম্পহাউস থেকে টালিনালা সংযোগাকারী খালমারফৎ টালিনালায় পড়ে। কিন্তু জোয়ারের সময় টালিনালায় জলের লেভেল বেশি থাকে তখন এই পাম্পগুলি চালিয়ে জল নিকাশ করতে থাকলে পাম্প থেকে টালিনালা সংযোগকারী খালের লেভেল বেশি বেড়ে গিয়ে পাশাপাশি নিচু এলাকায় সেই জল ঢুকে পড়ে এবং সেখানে বসবাসকারী জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন থাকলেও জোয়ারের সময় এই পাম্পগুলি বন্ধ রাখতে হয়।

উত্তরভাগ পাম্পিং স্টেশন

কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সোনারপুর—আরাপাঁচ মাতলা বেসিন ড্রেনেজ স্কিমের প্রথম অংশের সার্থক রূপায়ণের একটি নিদর্শন হল উত্তরভাগ পাম্পিং স্টেশন। সোনারপুর, দক্ষিণ গড়িয়া, বারুইপুর, রামনগর এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রতি

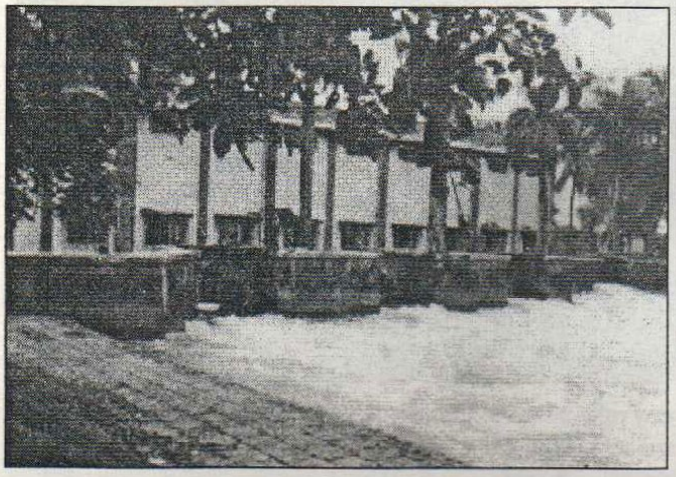

উত্তরভাগ পাম্প দিয়ে দক্ষিণ শহরতলীর জল মাতলা নদীতে পাঠানো হচ্ছে।

বছর বর্ষার সময় দীর্ঘদিন জলমগ্ন থাকত—খারিফ চাষ সেখানে সম্ভব হত না। এই অবস্থা দূর করার জন্য সোনারপুর আরাপাঁচ খাল খনন করে সেই খালের মুখে নির্মাণ করা হয় উত্তরভাগ পাম্পিং স্টেশন। সেখানে পশ্চিম জার্মানি থেকে নিয়ে আসা পাম্প—মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে ১৯৫৩ সালে এই পাম্পিং স্টেশন চালু করা হয়। সোনারপুর-বারুইপুর এলাকার জল সোনারপুর, আরাপাঁচ খালপথে উত্তরভাগে এসে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে পাম্প করে সেই জল পিয়ালী নদীর গতিপথ বরাবর মাতলা নদীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে সুদীর্ঘকাল এই প্রাচীন পাম্পিং স্টেশন সুষ্ঠুভাবে জনগণের সেবায় নিযুক্ত রয়েছে এবং এই পাম্পের সেবিত অঞ্চল থেকে এখন প্রতি বছর প্রচুর খারিফ ফসল উৎপন্ন হয়।

এরপর সোনারপুর-বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চল ঘনবসতিপূর্ণ শহর গড়ে উঠলে বর্ধিত ড্রেনেজের জন্য উত্তরভাগে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে আরও একটি অতিরিক্ত পাম্পিং স্টেশন চালু করা হয়।

সমস্যাসমূহ :

(ক) *রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা*—সম্পূর্ণ বিদেশি প্রযুক্তিতে নির্মিত অক্ষমুখী যেসব পাম্প এখানে বসানো হয়েছে তা উন্নত কারিগরি বিদ্যার এক বিশেষ নিদর্শন। কিন্তু এখন পুরোপুরি বিদেশি যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে এই পুরানো পাম্পিং স্টেশন সুষ্ঠুভাবে চালু রাখার কাজ বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কারিগরি বিদ্যার প্রয়োগ এসে পড়ে, ফলে পাম্প এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির মডেলের পরিবর্তন হয়। এই অবস্থায় পুরানো পাম্পের যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না। তাই এখন কোনো যন্ত্রপাতি অচল হয়ে পড়লে বা ভেঙে গেলে তা মেরামতি করিয়ে বা নতুনভাবে তৈরি করিয়ে পাম্প চালু রাখতে হয়। যন্ত্রপাতির গুণগতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দেশীয় প্রযুক্তির সহায়তায় এইসব ভারী পাম্পের যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নিতে হয়। এইরকম কটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা এখানে বলা হল।

(i) *সাকশন বেল এবং ফিকস্‌ড গাইড ভেন পুনর্নির্মান* : ১৯৯৩ সালে ৩নং পাম্পের সাকশন বেল এবং ফিকস্‌ড গাইড ভেন ভেঙ্গে পাম্পটি অচল হয়ে পড়ে। এরপর নতুনভাবে সেগুলি তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়।

(ii) *নতুন পন্থায় কুলার তৈরি করানো* : পাম্পের গিয়ারবক্সের তেল ঠাণ্ডা করার জন্য যে অয়েল কুলার ব্যবস্থা ছিল, দীর্ঘদিন কাজ করার পর তা আর ঠিকমতো কাজ করছে না বলে লক্ষ করা যায়। এ অবস্থায় তেল ঠাণ্ডা করার যন্ত্রটিকে নতুন পন্থায় নির্মাণ করিয়ে বেশ ভাল ফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

(iii) *কলাম পাইপের বিশেষ স্থানের ক্ষয় প্রতিরোধ*—উত্তরভাগ অতিরিক্ত পাম্পগুলির কলাম পাইপের ইমপেলারের ঘূর্ণায়মান অংশে বিশেষ ধরনের ক্ষয় লক্ষ করা যায়। তখন সেই স্থানে ১৮ সেমি চওড়া ফসফর ব্রোঞ্জের বেড় পরিয়ে সুফল পাওয়া যায়।

প্রতি বছর বর্ষার আগে এই পাম্পগুলি এবং তার ভারী মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় মেরামতির ব্যবস্থা করা এছাড়া প্রতি তিন বছরে একবার নিয়মমাফিকভাবে পাম্পের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশে গলানো ধাতুর প্রলেপ আরোপ করা হয়। পাইপ লাইন ও অন্যান্য অংশ বালির ঝাপটা দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে সেখানে রজন মিশ্রিত এপোক্সি রং করিয়ে জল ও মরিচাধরাজনিত ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

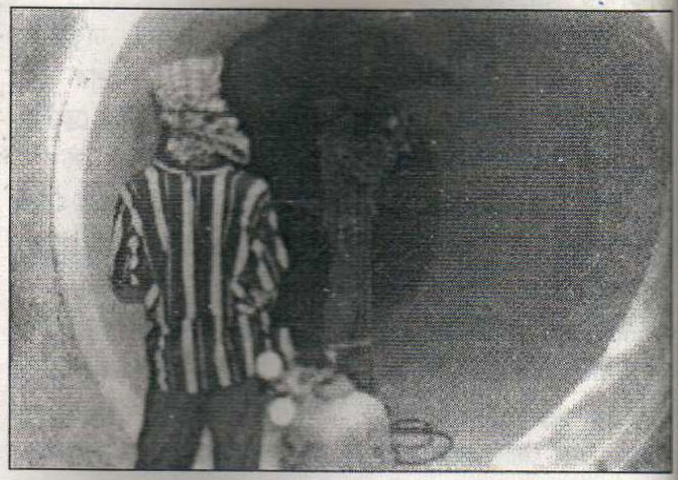

গলানো ধাতুর প্রলেপ উত্তর ভাগের যন্ত্রাংশে আরোপ করা হচ্ছে।

ই সব পাম্প চলার সময় পাম্পের যন্ত্রপাতির বিভিন্ন অংশের দিকে রশেষভাবে নজর রাখতে হয়। এইভাবে প্রয়োজনমতো ক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ও নজরদারির ফলে দীর্ঘদিনের এই পুরানো াম্পগুলি এখনও সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

হয়। আবার জল নামাবার উদ্দেশ্যে একসঙ্গে বেশি পাম্প চালালে বিদ্যুতের খরচ বেড়ে যায়। তাই এলাকার প্রয়োজন এবং বৃষ্টিপাতের দিকে লক্ষ রেখে সঠিকভাবে পাম্প চালানোর দিকে নজর দিতে হয়। এই সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হলে বা লাইনের

ালের উপরে ফেলা আবর্জনা এবং জমা মাটি জল নিকাশের বাধা হচ্ছে।

(খ) ***পাম্পিং স্টেশনে জল পৌঁছানোর পথে বাধা***—নারপুর, সুভাষগ্রাম, দক্ষিণ গড়িয়া, বারুইপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এখন বসতি গড়ে উঠেছে। পরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে এইসব াকার বেশ কিছু অঞ্চলের জল সুষ্ঠুভাবে খালে এসে পৌঁছাতে র না। স্থানে স্থানে মানুষ যাতায়াতের জন্য শাখাখালের ওপর নক সময় পাইপ বসিয়ে পারাপারের রাস্তা বানিয়েছে এবং এর ল এইসব খালের জলপথ অনেকাংশে সংকুচিত হয়েছে। এছাড়া থেকে মাছ ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে পাটা প্রভৃতি বসাবার ফলে ম্প জল পৌঁছানোর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে এই এলাকার জল নামতে দেরি হয়।

(গ) ***পাম্প চালানো নিয়ন্ত্রণের সমস্যা***—সব পাম্প মেশিনের ত্র একটি সর্বনিম্ন জলের স্তম্ভ বজায় রেখে পাম্প চলাতে হয়। নীচে পাম্প চালালে ক্যাভিটেসনের জন্য পাম্পের বিশেষ ক্ষতি

ভোল্টেজ কমে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(ঘ) **অর্থনৈতিক সমস্যা**—শুধু বর্ষার সময় বছরে চার-পাঁচ মাসের জন্য এই পাম্পগুলি চালাবার প্রয়োজন হয় এবং তখন তার জন্য প্রচুর বিদ্যুতের প্রয়োজন। আর বাকি সাত-আট মাস সেখানে বিদ্যুতের চাহিদা খুব সামান্য থাকে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহকারী পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের নিয়মে সরবরাহের জন্য কেবল একই হারে বিদ্যুৎ সরবরাহ চাহিদার চুক্তি করতে হয় এবং সেই চুক্তিবদ্ধ চাহিদা এবং বিদ্যুৎ শক্তির খরচের ওপর টাকা দিতে হয়। কিন্তু এই জনহিতকর পাম্পিং ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য উপকৃত এলাকা থেকে কোনরূপ রাজস্ব আদায় করা হয় না। ফলে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় চালু রাখার জন্য সারা বছরের জন্য বিদ্যুৎ চাহিদা চুক্তির যে অর্থনৈতিক বোঝা সরকারের উপর এসে পড়ছে তার কথা চিন্তা করা দরকার।

বাগজোলা খালের ওপর-অংশের জন্য আর একটা বড় পাম্পিং স্টেশন চালু হতে চলেছে। এইসব পাম্প চালানোর ক্ষেত্রে বছরের না চালানো সময়ের জন্য বিদ্যুতের ব্যয়ভার বহনের বোঝা থেকে পরিত্রাণের বিষয়টি চিন্তা করার সময় এসেছে।

জোয়ারের সময়ও খালের জলের লেভেল নামিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং তখন শহরের জল নিকাশও বেশি হবে। এ বিষয় একটি প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য ১৯৮৯ সালে পাঠানো হয়েছে।

(খ) যেখানে সেখানে প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলা বন্ধ করতে হবে।

উত্তরভাগ ও চৌভাগা পাম্পিং স্টেশনসমূহ এবং সেগুলি চালাতে বিদ্যুৎ খরচের হিসাব :

ক্রমিক সংখ্যা	পাম্পিং স্টেশন	প্রতিটি পাম্পের ক্ষমতা x সংখ্যা (কিউসেক x সংখ্যা)	প্রতিটি মোটরের ক্ষমতা (কিলোওয়াট)	চালু হওয়ার বছর	বিগত তিন বৎসরের চালান পাম্প-ঘণ্টার এবং বিদ্যুতের খরচের পরিমাণ		
					১৯৯৯-২০০০	২০০০-২০০১	২০০১-২০০২
১.	উত্তরভাগ (পুরানো)	২৫০ x ৪	৪৬৪	১৯৫৩	পাম্প ঘণ্টা ৪৯৩৬ টাকা ৫২,৯৭,৪০০	পাম্প ঘণ্টা ২৪৯৩ টাকা ৪৫,৫৭,০০০	পাম্প ঘণ্টা ২৬৭৫ টাকা ৩৬,৮৮,০০০
২.	উত্তরভাগ (অতিরিক্ত)	৫০ x ৫	১২৭	১৯৮৯	পাম্প ঘণ্টা ৮৭০৭ টাকা ২২,৩৪,০০০	পাম্প ঘণ্টা ৫২৯৪ টাকা ১৫,২০,০০০	পাম্প ঘণ্টা ৬৭০৭ টাকা ২০,১২,০০০
৩.	চৌভাগা (পুরানো)	৫০ x ৯	৭৫	১৯৬৬-৬৭	পাম্প ঘণ্টা ১৯৬৩ টাকা ১৮,২৫,০০০	পাম্প ঘণ্টা ৮৭৬ টাকা ১০,৯৫,০০০	পাম্প ঘণ্টা ২১১২ টাকা ১৩,২০,০০০
৪.	চৌভাগা (অতিরিক্ত-১নং)	৫০ x ১০	১০০	১৯৭২-৭৩	পাম্প ঘণ্টা ১৩৫৮৪ টাকা ৩৮,২০,০০০	পাম্প ঘণ্টা ৯৭২২ টাকা ৩৩,২৯,০০০	পাম্প ঘণ্টা ১৯৭৭০ টাকা ৩৬,৬৯,০০০
৫.	চৌভাগা (অতিরিক্ত-২নং)	৫০ x ১০	৯০	১৯৯১-৫টি ১৯৯৪-৫টি	পাম্প ঘণ্টা ১০৩১০ টাকা ২৮,৯৯,০০০	পাম্প ঘণ্টা ৮১৮০ টাকা ২৮,০১,০০০	পাম্প ঘণ্টা ১৮৪০৬ টাকা ৩৪,১৬,০০০

ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য করণীয় বিষয় :

(ক) কলকাতার ড্রেনেজের বেশির ভাগ জল কর্পোরেশন এবং সেচ দপ্তরের পাম্প দিয়ে স্টর্ম ওয়াটার ফ্লো ক্যানেলের মাধ্যমে ঘুষিঘাটায় অবস্থিত স্লুইস গেট দিয়ে বিদ্যাধরী নদীতে পড়ে কিন্তু জোয়ারের সময় নদীতে জলের চাপে এই স্লুইস গেটের ফ্ল্যাপ ভাল্‌ভ বন্ধ থাকে এবং সেই সময় এই জল খাল থেকে নদীতে পড়তে পারে না। ঘুষিঘাটায় যদি জোয়ারের সময় খাল থেকে নদীতে জল বের করে দেওয়ার জন্য একটি বড় পাম্পিং স্টেশন করা যায় তাহলে প্লাস্টিক চট করে নষ্ট হয় না এবং খালপথে জল নিকাশে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে।

(গ) খালের পাশে বসবাসকারী জনসাধারণকে খালে আবর্জনা ফেলার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। কেননা এই জঞ্জাল জল নিকাশের বাধা হয়ে শহরবাসীর অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় (চিত্র নং-৪)। আবার খালের গর্ভে এসে জমা হওয়া মাটি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিয়ে জলপথকে বাধামুক্ত রাখতে হবে।

নির্মলকুমার উপাধ্যায় ☐ অধীক্ষক বাস্তুকার/সেচ ও জলপথ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকা

পশ্চিমবঙ্গে বন্যাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ প্রায় ৩৭,৬৬০ বর্গকিমি, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তন ৮৮,৭৫১ বর্গকিমি। এই বন্যাপ্রবণ এলাকা রাজ্যের ১১১টি ব্লকে বিস্তৃত। বিগত ৪৪ বছরে এই রাজ্যে ভয়ঙ্কর বন্যা হয়েছে ৫ বার। ২০,০০০ বর্গকিমি বেশি এলাকা প্লাবিত হয়েছে চারবার। নিম্নলিখিত সারণিতে গত ৪৪ বছরের বিভিন্ন সময়ের বন্যা কবলিত এলাকার বিবরণ দেওয়া হল।

বন্যা কবলিত এলাকা (বর্গকিমিতে)	বন্যাকবলিত বছর	মোট বছরের সংখ্যা
৫০০ পর্যন্ত	১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৭	৫ বার
৫০০ থেকে ২০০০	১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৯৬	৮ বার
২০০০ থেকে ৫০০০	১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৮০, ১৯৮১, ও ১৯৮২	১০ বার
৫০০০ থেকে ১০,০০০	১৯৭৩, ১৯৭৭, ১৯৯৩, ১৯৯৫ এবং ১৯৯৮	৫ বার
১০,০০০ থেকে ১৫,০০০	১৯৬৮, ১৯৭৯, ১৯৮৩, ১৯৯০ এবং ১৯৯৯	৫ বার
১৫,০০০ থেকে ২০,০০০	১৯৭১, ১৯৮৬, ১৯৮৭ এবং ১৯৮৮	৪ বার১
২০,০০০ এর উপর	১৯৭৮, ১৯৮০, ১৯৮৪ এবং ২০০০	৪ বার

পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ

পীযূষকান্তি বসু

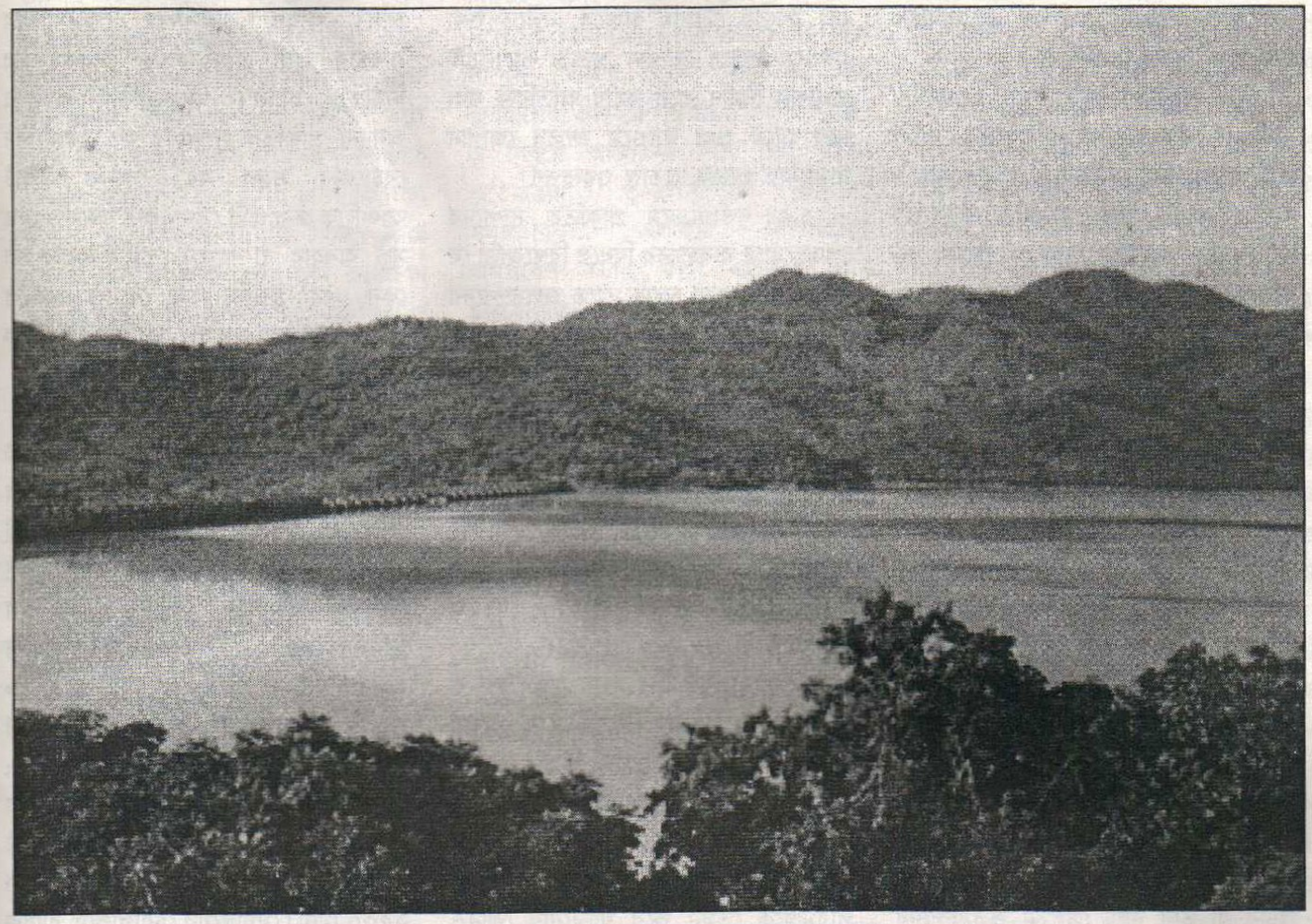

ময়ূরাক্ষী জলাধার।

ছবি : দিলীপ কর্মকার

১। প্রাক্-কথন :

১.১। পৃথিবীতে জলের প্রশ্নাতীত প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও, ব্যবহারযোগ্য জলের অভাব দেখা দিতে পারে, এই ধরনের আশঙ্কা বিশ্বাস করাই কঠিন। জাতিপুঞ্জের হিসাবানুযায়ী, পৃথিবীতে জলের পরিমাণ ১৪০ কোটি ঘন কিলোমিটার যা দিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে ৩ কিমি পুরু জলের আস্তরণ তৈরি হতে পারে। কিন্তু মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে তিন-চতুর্থাংশ ও জলের প্রায় ৯৭ শতাংশ অধিকার করে আছে। মানুষের ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ তাই নিতান্তই স্বল্প প্রায় ২.৭ শতাংশ। এই জলের ৭৫.২ শতাংশ আবার মেরু অঞ্চলে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে, ২২.৬ শতাংশ ভূস্তরের অভ্যন্তরে জমা হয়ে আছে। ভূজলের একটি বড় অংশ মাটির তলায় এত গভীরে জমা আছে যে তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সৌভাগ্যক্রমে ব্যবহারযোগ্য জলের বাকি সামান্য অংশ সূর্যালোক পরিচালিত জলচক্রের দ্বারা ক্রমাগত নবীকৃত হয়ে মানবসমাজ বিকাশে নিরন্তর সাহায্য করে চলেছে। পুনর্নবীকৃত এই জলসম্পদ প্রধানত নদী, খাল, বিল, হ্রদ, মাটি ও উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। ভূজল এবং নদী ও হ্রদ, খাল, বিল ইত্যাদির একটি অংশমাত্রকেই মানুষ নিজের কাজে লাগাতে পারে।

১.২। সারা পৃথিবীতে গত তিন শতকে জলের ব্যবহারের মাত্রা প্রায় ৩৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৩২৫০ ঘন কিলোমিটার জল মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, যার প্রায় ৬৯ শতাংশ কৃষি কাজে, ২৩ শতাংশ শিল্পে ও প্রায় ৮ শতাংশ পানীয় জল ও গৃহকর্মে ব্যয় হয়। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে জলের ব্যবহারের মাত্রা আবার পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। আফ্রিকা, এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকায় কৃষিতে জলের প্রয়োজন সর্বাধিক। এশিয়া মহাদেশে যখন কৃষিকাজে প্রয়োজন প্রায় ৬৯ শতাংশ, উত্তর আমেরিকায় ও ইউরোপে তখন শিল্প ও গৃহস্থালির কাজে জলের প্রয়োজন কৃষির চেয়েও বেশি।

১.৩। ব্যবহারযোগ্য জলের পুনর্নবীকরণ সত্ত্বেও এর পরিমাণ সীমিত। জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাই মাথাপিছু ব্যবহারযোগ্য জলের জোগান কমতেই থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য জল যে একটি মহার্ঘ বস্তুতে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকার

কথা নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্ভাব্য প্রবল জনস্ফীতির ফলে কৃষি, শিল্পায়ন ও নগরায়নের প্রয়োজনে জলের ব্যবহার দ্রুত বাড়ার সম্ভাবনা। সীমিত জোগান ও পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সামগ্রিক সঙ্কটকে অন্যতর মাত্রা দেবে।

১.৪। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মল জলকে অনেকেই স্বাভাবিক প্রাপ্তি হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মানবসমাজ ও পরিবেশরক্ষার স্বার্থে প্রকৃতিদত্ত জলচক্রের সুষ্ঠু ব্যবহার আজকের দিনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে অনেকেই মনে করেন। অনেক দেশেই জনসংখ্যা সেই দেশের নিজস্ব জলসম্পদ দ্বারা পোষণযোগ্য জনসংখ্যার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ধরনের সংখ্যাবৃদ্ধিই পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জলসঙ্কটের আভাস দিচ্ছে। ১৯৮৯ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যবহারযোগ্য জলের জোগানের নিরিখে একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মাথাপিছু বাৎসরিক গড়ে ১৭০০ ঘনমিটার জলের জোগান যে দেশগুলিতে আছে সেখানে জলাভাব অতি বিরল ঘটনা। জলাভাব ঘটলেও তা অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকবে, যে সব দেশে এই অঙ্কটি ১০০০ ঘন মিটার বা তার নীচে সেখানে জলসম্পদের জোগান অপ্রতুল এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশরক্ষার কর্মসূচি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে এই অঙ্কটি আরও কম অর্থাৎ ৫০০ ঘনমিটার কিংবা তারও কম, সেখানে জীবনবিকাশের পথে জলের অপ্রতুলতাই প্রধান অন্তরায়। ১৯৫৫ সালে মাত্র সাতটি দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক জলের জোগান ছিল ১০০০ ঘনমিটার বা তারও কম। ১৯৯০ সালে এইসংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ২০তে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের আরও ১৫ থেকে ২০টি দেশ এই সারিতে এসে দাঁড়াবে এবং বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, জলসম্পদের এই অভাবের মুখোমুখি হবেন।

১.৫। বর্তমানে পৃথিবীতে মাথাপিছু বাৎসরিক ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ গড়ে ৭০০০ ঘনমিটার। এই জলের উৎস অনেকটাই মৌসুমিবায়ু প্রভাবিত বর্ষণ যা বৎসরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জলসম্পদ নদীবাহিত হয়ে সমুদ্রে পড়ার আগেই যদি মানুষের কাজে না লাগানো যায় তবে উপরের অঙ্কটির কোনও মূল্যই থাকে না। ক্রান্তীয় মৌসুমি অঞ্চলে, নদীতে শুখা মরশুমে জলের জোগান অত্যন্ত কম। তাই জলাধার নির্মাণ করে বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রেখে শুখা মরশুমে জলের জোগান বাড়ানোর প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৬। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক সম্পদের পোষণযোগ্য ব্যবহারের বিষয়ে বিশ্বজোড়া যে ব্যাপক আলোচনা চলছে তাতে জলসম্পদের পোষণযোগ্য ব্যবহারের বিষয়টি প্রায়শ উপেক্ষিত। এমনকি, বিপুল জনস্ফীতির প্রেক্ষাপটেও এই আলোচনা কম। জল পৃথিবীপৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করে থাকার সুবাদে জলসম্পদের অপরিমেয়তা সম্বন্ধে তৈরি হওয়া ভ্রান্ত ধারণা, ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের অদূর ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ার বাস্তব অবস্থাকে অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

১.৭। যুগ যুগ ধরে মানুষ বৃষ্টির জল ও নদীপ্রবাহকে বিভিন্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে এবং এখনও আমাদের শিখতে হচ্ছে কী করে আরও ভালভাবে জলসম্পদকে ব্যবহার করতে পারি। কারণ, এই মূল প্রাকৃতিক উপাদানের পরিমাণকে তেমন করে বাড়ানোর কোনও প্রযুক্তি আজ পর্যন্ত আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। সমুদ্রের বিপুল জলরাশিকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকলেও, এই প্রযুক্তি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দূষণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীল। বাস্তব অবস্থা এই যে, ২০০০ বৎসর আগে যে পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ পাওয়া যেত, এখন তার পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি পায়নি, যদিও তখনকার জনসংখ্যা বর্তমান জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ ছিল। এ ছাড়াও, পৃথিবীর জলবায়ুর সম্ভাব্য পরিবর্তন, আঞ্চলিক স্তরে জলসম্পদকে নতুন করে বিভাজন বা জলসম্পদের জোগানকে প্রভাবিত করবে আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে, ভবিষ্যতে পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলকে দূষণমুক্ত রাখাটাই হবে মস্তবড় চ্যালেঞ্জ।

১.৮। জলসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে কোনও প্রয়াসকে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে ধরনের চ্যালেঞ্জের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। কারণ, জলসম্পদ খোলাবাজার ব্যবস্থার দ্বারা এখন পর্যন্ত সেরকমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়নি ; আন্তর্জাতিক বাজারে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মত জলসম্পদ বেচাকেনা সম্ভব নয়। কোনও একটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী সেখানকার জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বা অপচয় যাই-ই করুক না কেন, এর প্রভাব অন্য কোনও অঞ্চলে অনুভূত হয় না। জলসম্পদের এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা চ্যালেঞ্জের আরেকটি দিক।

২। ভারতবর্ষের জলসম্পদ :

২.১। তুষারপাতসহ বর্ষণজনিত জলসম্পদের পরিমাণ ভারতবর্ষে বৎসরে গড়পড়তা ১৯৫৩ ঘন কিলোমিটার। এই জলসম্পদের কিছু অংশের উৎস অবশ্য দেশের সীমানার বাইরে। পৃথিবীর ভূমিসম্পদের ২.৫ শতাংশ, ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের ৪ শতাংশ ও জনসংখ্যার ১৬ শতাংশ ভারতবর্ষে রয়েছে। গড়পড়তা বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও অসমান ; দেশের প্রায় ১২ শতাংশ ভূভাগে গড়পড়তা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬১০ মিমি থেকেও কম, ৮ শতাংশ অঞ্চলে এর পরিমাণ ২৫০০ মিমি। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যেমন ১১০০০ মিমি তেমনি পশ্চিম-রাজস্থানে এর পরিমাণ মাত্র ১১০ মিমি। একই স্থানে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে বিপুল অসমতা পরিলক্ষিত হয় এবং কম বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে এই অসমতা আরও অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গুজরাট ও রাজস্থানের কোনও কোনও এলাকার গড়পড়তা বৃষ্টিপাত কম হলেও মাঝে মাঝেই এই এলাকাগুলি প্রবল বৃষ্টিপাতের কবলে পড়ে।

২.২। দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির প্রবাহের ৯০ শতাংশ ও হিমালয়ের নদীগুলির প্রবাহের প্রায় ৮০ শতাংশ বয়ে যায় জুন-সেপ্টেম্বর মাসে। অনেক ছোট নদীর প্রবাহ গ্রীষ্মে পুরোপুরি শুকিয়ে যায়। ক্ষয়িষ্ণু অরণ্যচ্ছেদন এই সমস্যাটিকে আরও সংকটাপন্ন করেছে। অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জল মাটির তলায় চুঁইয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং এর ফলে

বর্ষার অতিরিক্ত জল ভূস্তরে সঞ্চিত থেকে শুখা মরশুমে নদীপ্রবাহকে বাড়ানোর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটাই ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয় এবং নদীগুলি শীতকালে শীর্ণকায় হয়ে পড়ে। অরণ্যাচ্ছাদন কমে যাওয়ার ফলে, নদীর পাহাড়ি উৎস অঞ্চল থেকে বেশি বেশি পরিমাণে পলি নদীপ্রবাহের সঙ্গে নেমে আসছে বর্ষাকালে। শীর্ণকায়া নদীগুলির পক্ষে এই বিপুল পরিমাণের পলি প্রবাহের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না ; নদীখাতে সেগুলি জমা হতে হতে নদীর স্বাভাবিক বহন ক্ষমতা অনেকাংশেই কমিয়ে দিচ্ছে। সমগ্র দেশের প্রায় ৪ কোটি হেক্টর জমি বন্যাপ্রবণ বলে চিহ্নিত, যদিও প্রতিবৎসরই এই পরিমাণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হয় না। নদীর প্লাবন অঞ্চলে নির্বিচারে বসতি স্থাপন কিংবা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখেই কৃষিকর্ম করার প্রবণতা, দেশে বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। পাশাপাশি, দেশের ১৫০টি জেলা খরাপ্রবণ হিসাবে চিহ্নিত। ৯টি রাজ্যের ৭১টি জেলা, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও, খরার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। খরাজনিত দুর্দশার প্রভাব বন্যাজনিত দুর্দশার থেকে সুদূরপ্রসারী ও তীব্রতর এবং জনমানসে বহুদিন তার ছাপ থেকে যায়। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় খরাপীড়িত অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈষম্য তীব্রতর হচ্ছে।

২.৩। ভারতবর্ষের ভূজল সম্পদ ;

২.৩.১। বৃষ্টির জলের কিয়দংশ মাটির অভ্যন্তরে চুঁইয়ে ভূজলে পরিণত হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া জল যেমন হ্রদ, সরোবর, পুকুর ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয়, তেমনি ভূ-জল মাটির নীচের জলস্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের উপরের জল ভূজলের মধ্যে একটি জটিল যোগসূত্র বর্তমান। ভূজলের একাংশ যেমন কোনও স্থানে উপরে উঠে এসে ভূপৃষ্ঠের জলে পরিণত হয় তেমনি আবার ভূপৃষ্ঠের জলও স্থানবিশেষে মাটির অভ্যন্তরে গিয়ে ভূ-জলে পরিণত হয়। ভূজল কতটা ব্যবহার করা যাবে তা নির্ধারিত হয় ভূজলস্তরের বার্ষিক ওঠানামার এবং আগামী ৩ থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে ভূজলস্তরের আরও যে সমৃদ্ধি ঘটতে পারে তার উপর। বার্ষিক ব্যবহারযোগ্য ভূ-জলসম্পদের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যবহারের পরবর্তী সময়ে ভূজলসম্পদের কতটা পরিমাণ বৃষ্টির দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে পুনর্নবীকরণ হচ্ছে তার উপর, যাতে পরবর্তী ৩ বা ৫ বৎসরের মধ্যে ব্যবহারজনিত কারণে ভূ-জলস্তর নেমে না যায়। নির্ধারিত পরিমাণের অনেক বেশি ভূ-জল ব্যবহারের ঘটনা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়তই ঘটছে। আইনি ব্যবস্থায় ভূ-জল-সম্পদের মালিকানা জমির মালিকানার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার ফলে অতিরিক্ত জল ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনা দুরূহ। এ বিষয়ে আলোচনা পরে করা যাবে। অতিমাত্রায় ভূ-জলসম্পদ ব্যবহারে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় নোনাজলের অনুপ্রবেশ ঘটার ফলে এলাকার জমি চাষযোগ্যতা হারাচ্ছে।

২.৩.২। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় রয়েছে ভূ-জলসম্পদের এক বিশাল ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের সম্ভাব্য পুনর্নবীকরণ সীমা পর্যন্ত যে পরিমাণ ভূ-জলসম্পদ ব্যবহার করা যাবে তার পুরোপুরি ব্যবহার এখন পর্যন্ত করা যায়নি। এই সম্পদ পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করার আর্থিক ও পরিবেশগত দিকগুলি আরও ভালভাবে যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে গাঙ্গেয় অববাহিকায় এক বিশাল এলাকায় ভূ-জলের আর্সেনিক দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশে সারাদেশব্যাপী প্রয়োজনীয় পানীয় জলের সরবরাহটাই ভেঙে পড়েছে ব্যাপক আর্সেনিক দূষণের কারণে।

২.৩.৩। বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য ভূ-জলসম্পদের পরিমাণ ৪০২ ঘন কিলোমিটার।

২.৩.৪। দেশের জলসম্পদের সুসংহত পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে গঠিত জাতীয় কমিশন-এর (১৯৯৯) হিসেব অনুযায়ী ভারতবর্ষে জলসম্পদের সামগ্রিক জোগান ১৯৫৩ ঘন কিমি (৪০২ ঘন কিমি. ভূ-জলসম্পদের পরিমাণ ধরে) ; ব্যবহার-যোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ ১০৮৬ ঘন কিমি (৬৯০ ঘন কিমি ভূপৃষ্ঠের উপরের জল ও ৩৯৬ ঘন কিমি. ভূজল)। এ পর্যন্ত প্রায় ৬০০ ঘন কিমি জল ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত ভূ-জলসম্পদের ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের জোগানকে প্রভাবিত করবে নিঃসন্দেহে। প্রায়শ, মাঝারি ও ছোট শহরগুলি থেকে অশোধিত দূষিত বর্জ্য জল, কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য জল ও অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে দূষিত জল চাষের জমি থেকে বেরিয়ে নদীতে পড়ে নদীর জলের দূষণমাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতি জলের চাহিদাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে চাহিদা-জোগানের এক সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি তৈরি করছে। জাতীয় কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ সারা দেশে সামগ্রিকভাবে জলসম্পদের চাহিদা জোগানের সমান হবে এবং কোনও কোনও অঞ্চলের চাহিদা জোগানকে অতিক্রম করে যাবে।

৩। পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ :

৩.১। ৮৮৭৫২ বর্গ কিমি আয়তন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের প্রায় ২.৭ শতাংশ ভূভাগ অধিকার করে আছে। জনসংখ্যার বিচারে, সকলেই জানেন, ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই রাজ্যে জনবসতির ঘনত্ব দেশের মধ্যে সর্বাধিক—প্রতি বর্গ কিমি ৯০৪ জন সেখানে সমগ্র দেশের গড়পড়তা জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩২৪। দেশের জনসমষ্টির প্রায় ৮ শতাংশ এখানে বাস করে।

৩.২। নদী অববাহিকা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ সুবিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকার অন্তর্গত তাছাড়া মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশ সুবর্ণরেখা নদীর অববাহিকার, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনার কিছু অংশ রায়মঙ্গল ইত্যাদি নদীর মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। অববাহিকা হিসেবে রাজ্যকে ৩টি প্রধান অববাহিকা অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

১। ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা : আয়তন ১২,৫৮৫ বর্গ কিমি
পাঁচটি উপ-অববাহিকার সমষ্টি

২। গঙ্গা অববাহিকা : আয়তন ৭২,৬১৮ বর্গ কিমি
যা ২০টি উপ-অববাহিকার সমষ্টি

৩। সুবর্ণরেখা অববাহিকা : আয়তন ৩৫৪৭ বর্গ কিমি

এই রাজ্য ৩টি বৃহৎ অববাহিকা ও ছোট-বড় ২৬টি উপ-অববাহিকার সমষ্টি।

৩.৩। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ কী তা সমীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রাক্তন সেচমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য মহাশয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। রাজ্যে ওই প্রথম এই ধরনের সমীক্ষা করা হয়। কমিটি

প্রত্যেকটি উপ-অববাহিকা ধরে ধরে নদীপ্রবাহের পরিমাণ হিসেব করে ভূপৃষ্ঠের উপরের মোট জলসম্পদের পরিমাণ ১৩২.৯০ লক্ষ হেক্টা-মিটার স্থির করেন। ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ কিন্তু মোট জলসম্পদের ৪০ শতাংশের কাছাকাছি অর্থাৎ ৫৩.১০ লক্ষ হেমি। ভূ-জলের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ স্থিরীকৃত হয় ১৪.৬০ লক্ষ ঘনমিটারে। কেন্দ্রীয় ভূ-জলপর্ষদের ১৯৯৫ সালের তথ্যানুযায়ী এই সম্পদের পরিমাণ ২০.৩০ লক্ষ হেক্টা-মিটার। তাঁরা আরও হিসেব করে দেখিয়েছেন যে এই ভূ-জলসম্পদের প্রায় ১২ শতাংশের উৎস সেচসেবিত এলাকার খালের জল। নদী অববাহিকার ভিত্তিতে জলসম্পদের মোট পরিমাণ ১ নং সারণিতে দেওয়া হল। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী রাজ্যের উৎসভিত্তিক জলসম্পদের পরিমাণ তাহলে—

সারণি-১

উৎস	মোট জলসম্পদের পরিমাণ	ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ (লক্ষ হেমি)
১। নদীবাহিত, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয়ে সঞ্চিত	১৩২.৯০	৫৩.১০
২। ভূজল	২০.৩০	২০.৩০
মোট	১৫৩.২০	৭৩.৪০ বা ৭৩ লক্ষ হেমি।

৩.৪। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির কতটা জলসম্পদ ব্যবহার করা যাবে রাজ্যের প্রয়োজনে তা অনেকটাই নির্ভর করে আন্তর্জাতিক নদীগুলির জলসম্পদের বিভাজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। গঙ্গা অববাহিকার উজানে অবস্থিত অন্যান্য প্রদেশগুলি সুবিধা অসুবিধা বিভাজনের প্রশ্নে এগিয়ে আসছে না। একইভাবে তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক নদীগুলির জলসম্পদ বিভাজনের প্রশ্নটি একটু অনিশ্চিত রয়েই গেছে। তিস্তার জলচুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে।

৩.৫। ভূ-জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অতি সম্প্রতি কতকগুলি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। রাজ্যে ৭৮টি ব্লকে নলকূপের জলে আর্সেনিক দূষণ লক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি হচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা। ব্লকে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ভূজলকে অন্তত ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও, রাজ্যের প্রায় ৬০টি ব্লকে ভূজল সম্পদের ৮৫ শতাংশ বা তার বেশি ব্যবহার করা হয়ে গেছে। ভূ-জলস্তর আরও নেমে গেলে, ভূ-জলসম্পদ আহরণ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার রাজ্য জুড়ে গভীর ও অগভীর নলকূপ ও তার ব্যবহারের শুমারি শুরু করেছে। আরও কিছুদিনের মধ্যে ভূ-জলসম্পদের সাম্প্রতিকতম তথ্য পাওয়া যাবে।

৪। পশ্চিমবঙ্গে জলের চাহিদা :

৪.১। এ তো গেল জোগানের দিক। জলসম্পদের চাহিদার একটি হিসেবও বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেছিলেন ১৯৮৪-৮৫ সালে। সেই প্রতিবেদনে ২০১০ সাল নাগাদ রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলের চাহিদার একটি চিত্র পাওয়া যায়। রাজ্যের মোট চাহিদার চিত্রটি, বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, নিম্নরূপ :

বিশেষজ্ঞ কমিটির চাহিদার চিত্রটি একটু বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই নিবন্ধে।

	ক্ষেত্র	জলের চাহিদা (লক্ষ হেমি)
১।	কৃষি	৫৩.৮০
২।	গৃহস্থালি ও শিল্প	৫.২০
৩।	বিদ্যুৎ	৩.১০
৪।	জলপথের নাব্যতা রক্ষা	৩৫.৩০
৫।	বনসৃজন ও সংরক্ষণ	০.১০
৬।	পরিবেশ, মৎস্যচাষসহ প্রাণীসংরক্ষণ	১০.০০
		১০৮.০০ বা ১১০ লক্ষ হেক্ট-মিটার

৪.২। কৃষিকাজে জলের চাহিদা :

৪.২.১। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক ভূভাগের প্রায় ৬৫ শতাংশ জমি চাষযোগ্য বলে বিবেচিত। আবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ৫৪.৪০ লক্ষ হেক্টর (২০০-০১) বিশেষজ্ঞ কমিটি ৫৩.৮০ লক্ষ হে. চাষের জমিকে বহুফসলি করার লক্ষ্যে শস্যচারা গোড়ায় সামগ্রিকভাবে (অর্থাৎ খরিফ রবি ও বোরো খন্দে) ১ মিটার জল প্রয়োজন হবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞ কমিটির মতে, এই লক্ষ্যে পৌঁছে ৫৩.৮০ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজন হবে, ২০২৫ সাল নাগাদ। জাতীয় কমিশন অবশ্য কৃষিসেচের জন্য ২০২৫ সাল নাগাদ ২৩.৭০/২৬.৪০ হেমি জলের প্রয়োজন হবে বলে হিসেব করেছেন। এই জলের জোগান নদী, হ্রদ, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদিতে সঞ্চিত জল থেকে ১৫.৯/১৭.৪ লক্ষ হেমি ও ভূজলসম্পদ থেকে ৭.৮/৯.০০ লক্ষ হেমি আসবে। কমিটি ও কমিশনের হিসেবে গরমিল লক্ষ করা যাচ্ছে। গরমিলের প্রধান কারণ কমিটির হিসেব অনুযায়ী ৫৩.৮০ লক্ষ হে আবাদি জমিকে বহুফসলি করার লক্ষ্যে সর্বত্রই সেচের জল পৌঁছে দেওয়া যাবে না, বেশ কিছু অংশে বৃষ্টির জল ও স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির জল ধরে রেখে কৃষি সেচের প্রয়োজন মেটাতে হবে। পাশাপাশি, জাতীয় কমিশন এই রাজ্যে কৃষিসেচে জলের প্রয়োজন হিসেব করেছেন এইভাবে : ১৯৯৩-৯৪ সালে রাজ্যে সেচসেবিত আবাদি জমি ছিল ১৯.১১ লক্ষ হে ও সামগ্রিকভাবে ২৪.৯১ লক্ষ হে (প্রত্যেক খন্দে সেচসেবিত এলাকার যোগফল)। সেচসেবিত এলাকার সামগ্রিক আয়তন ২০১০ সালে বেড়ে ৩০.২২ লক্ষ হে, ২০২৫ সালে ৩৮.৭২ লক্ষ হে ও ২০৫০ সালে ৪১.৮০ হে. হবে। এর জন্য ২৯.৩০/৪১ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজনও হবে।

৪.২.২। জাতীয় কমিশন অবশ্য বিভিন্ন

চাষে (খরিফ, রবি ও বোরো খন্দে) জমিতে সর্বসাকুল্যে ৬১ সেমি (খাল বাহিত সেচব্যবস্থায়) ও ৪৯ সেমি (ভূ-জল দ্বারা পরিষেবিত সেচ ব্যবস্থায়) জল লাগবে বলে ধরে নিয়েছেন, সারাদেশের গড়পড়তার ভিত্তিতে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে, যেখানে ধান চাষের বিপুল প্রাধান্য, চাষের জন্য জলের প্রয়োজন অনেক বেশি।

৪.২.৩। কৃষি বিভাগ রাজ্যের জনবৃদ্ধি ও সেই অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আগামী ১০ বৎসরের এক কর্মসূচি তৈরি করে বিস্তৃত আলোচনার জন্য পেশ করেছে। ২০১০ সালে জনবৃদ্ধির বর্তমান হারে, জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৯ কোটি ৪০ লক্ষ। এই জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে ১৭১ লক্ষ টন তন্ডুলশস্য, ১২ লক্ষ টন ডালশস্য ও ১৫.৪০ লক্ষ টন তৈলবীজ-এর প্রয়োজন হবে। ২০০০-০১ সালে এদের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ১৩৫.৬১ লক্ষ টন, ২.৩০ লক্ষ টন ও ৫.৬১ লক্ষ টন। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের আয়বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সরবরাহের ও সঠিক ব্যবহারের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কৃষিসেচের ক্ষেত্রে সেচসেবিত এলাকা আবাদি জমির ৪৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া ও চাষের নিবিড়তা বর্তমানের ১৭৪ শতাংশকে বাড়িয়ে ২০০ শতাংশ করার প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ আগামী ৮ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যে ৩৮.৩০ লক্ষ হে আবাদি জমিকে অন্ততপক্ষে দোফসলি করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত খরিফ (ধান) ও রবিখণ্ডে সর্বসাকুল্যে ৮৫ সেমি জলের প্রয়োজন ধরে নিয়ে কৃষিকাজে ৩৫.২২ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজন হবে। আবার শস্যক্রম যদি খরিফ (ধান ও বোরো (ধান) এ পর্যবসিত হয় (বোরো চাষের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে বড় চাষীদের এ প্রবণতা উড়িয়ে দেওয়া যায় না) তবে ৫০.৬০ লক্ষ হেমি জলের দরকার হবে।

৪.২.৪। জাতীয় কমিশনের সুপারিশ, রাজ্য কৃষি বিভাগের পরিকল্পনা ও সেচসেবিত এলাকা বাড়াতে যে বাস্তব সমস্যা আছে তা মনে রেখে বিভিন্ন সময়ে কৃষিকাজে আবাদি ও সেচসেবিত জমি এবং তার জন্য জলের প্রয়োজন নিম্নরূপ হবার সম্ভাবনাই বেশি :

৪.২.৫। এখানে লক্ষণীয় যে চাষের নিবিড়তা ২০০ শতাংশে নিয়ে যেতে পারলে সমগ্র সেচসেবিত এলাকার আয়তন দাঁড়াবে (প্রতি খন্দে সেচসেবিত এলাকার যোগফল) ২০২৫ সালে ৭৭.৪৪ লক্ষ হে. ও ২০৫০ সালে ৮৩.৬০ লক্ষ হে। এই রাজ্যে সেচসামর্থ্যের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হয়েছে ৬৯.৩৮ লক্ষ হে. (৩৬.১০ লক্ষ হে ভূপৃষ্ঠের উপরের জল ও ৩৩.১৮ লক্ষ হে ভূজলসম্পদ থেকে) সুতরাং এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শস্যচাষের নিবিড়তা ২০১০ সালে ১৭০ শতাংশ দাঁড়াবে। অর্থাৎ, ২০২৫ সালে বিভিন্ন খন্দে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে মোট ৬৯.৭০ লক্ষ হে ও ২০৫০ সালে ৭১.৬৪ লক্ষ হে। ২০৫০ সালে প্রথাগত সেচ ব্যবস্থার বাইরে থাকবে ২.২৬ লক্ষ হে। ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উঃ ও দঃ ২৪-পরগনা জেলায় প্রায় ১.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে নিকাশি খালগুলির মাধ্যমে জোয়ারের জল ঢুকিয়ে বোরো ধান চাষ হচ্ছে। এই প্রথাবহির্ভূত সেচ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছে।

সময়কাল	চাষযোগ্য জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)	আবাদি জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)	সেচসেবিত জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)	কৃষিসেচের জন্য জলের চাহিদা (লক্ষ হেমি)
২০১০	৫৯.৩২	৫৪.৯৪	৩০.২২	২৫.৭০
২০২৫	৫৯.৩২	৫৫.৩২	৩৮.৭২	৩২.৯০
২০৫০	৫৯.৩২	৫৫.৭১	৪১.৮০	৩৫.৫০

৪.৩। **গৃহস্থালির কাজে জলের চাহিদা :**

৪.৩.১। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৮ কোটি (২০০১ আদম-শুমারি) এর মধ্যে ৫.৭৭ কোটি মানুষ বাস করেন গ্রামে ও ২.২৫ কোটি লক্ষ মানুষ বড়, মাঝারি ও ছোট শহরগুলিতে। জনবৃদ্ধির বর্তমান হার অনুযায়ী ২০১০ সালে এই রাজ্যের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৯.৪০ কোটিতে। আশা করা যায় জনবৃদ্ধির বর্তমান হার (১৭.৮৪%) ক্রমশ নিম্নমুখী হবে এবং ২০৫০ সালের আশেপাশে ১১.১২ কোটিতে স্থিতিশীল হবে। ২০৫০ সালে শহরবাসীর সম্ভাব্য সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ কোটি ও গ্রামাঞ্চলে ৬.৫০ কোটি। পানীয় জল, গৃহস্থালির অন্যান্য প্রয়োজন ও পৌর পরিষেবার প্রয়োজনে জলের চাহিদা নিরূপণ করতে গিয়ে জাতীয় কমিশন, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটির এই বিষয়ে সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করে, নিম্নোক্ত মাপকাঠি সুপারিশ করেছেন : (সারণি নীচে দেখুন)

৪.৩.২। উপরের মাপকাঠি অনুযায়ী ২০১০, ২০২৫ ও ২০৫০ সালে এই ক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন এই রাজ্যে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪.০০ লক্ষ হেমি, ৫.৩০ লক্ষ হেমি ও ৮.২০ লক্ষ হেমি।

৪.৪। **শিল্পবিকাশের জন্য জলের প্রয়োজন :**

৪.৪.১। উৎপাদন চলছে এমন কলকারখানা এবং ভবিষ্যতে শিল্পবিকাশের জন্য কতটা জল প্রয়োজন হবে তা নিরূপণ করা একটু দুরূহ কারণ এ বিষয়ে কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, চালু শিল্পগুলিতে কতটা জল সরবরাহ করা হয় এবং কলকারখানার বর্জ্য জলের কতটা পরিমাণ পরিশোধিত করে সেই কারখানাগুলিতে ব্যবহার করা যায়, এ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি। কোনও কোনও অববাহিকায় কৃষিসেচের জন্য নির্দিষ্ট করা জল ইতিমধ্যেই তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে

	দৈনিক মাথাপিছু জলের প্রয়োজন লিটারে		
জনসংখ্যার প্রকার ভেদ	২০১০	২০২৫	২০৫০
প্রথম শ্রেণীর শহর	২২০	২২০	২২০
অন্যান্য শহর	১৫০	১৬৫	২২০
গ্রাম	৫৫	৭০	১৫০

শিল্পবিকাশের জন্য রাজ্য সরকার যে সব রূপরেখা তৈরি করেছেন বা করছেন, সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব অববাহিকাতেই জলের টান পড়বে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতিতে, এই বিষয়ে জাতীয় কমিশনের সুপারিশ আলোচনা করা যেতে পারে। কমিশন, কৃষিসেচের জন্য নির্দিষ্ট জল বরাদ্দের ১০ শতাংশ শিল্পের জন্য বরাদ্দ করেছেন (তাপবিদ্যুতের জন্য প্রয়োজনীয় জল ছাড়াই)। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজমির অপ্রতুলতা হেতু শিল্পবিকাশের গুরুত্ব আরও অনেক বেশি বাড়বে, এই লক্ষ্য নিয়ে ভবিষ্যতে শিল্পবিকাশের জন্য ২০১০, ২০২৫ ও ২০৫০ সালে জলের চাহিদার পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩ লক্ষ হেমি, ৪ লক্ষ হেমি ও ৫.০০ লক্ষ হেমি। এই হিসেব করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জন্য জলের প্রয়োজন যেমন সারাদেশের গড়পড়তা থেকে কিছুটা বেশি ধরা হয়েছে, তেমনি সময়ের সঙ্গে বর্জ্য জল পরিশোধন করে পুনরায় ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত করে শিল্পোদ্যোগীরা তার যথাযথ ব্যবহার করবেন সে আশা রাখা হয়েছে।

৪.৫। **বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলের প্রয়োজন :**

৪.৫.১। যদিও পশ্চিমবঙ্গে আগামীদিনে বিদ্যুতের প্রয়োজনে হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলি থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু নানা কারণে সেই সুযোগের ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে যে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করার প্রয়োজন তার জন্য উপযুক্ত নির্মাণস্থানগুলি সবই রাজ্যের সীমানার বাইরে অবস্থিত। (তিস্তা নদীর ক্ষেত্রে সিকিম রাজ্য, তোরসা, মানস বা সঙ্কোশ নদীর ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান ইত্যাদি)। আরেকটি কারণ, হিমালয়ে উঁচু বাঁধ তৈরি করে জলাধার নির্মাণে পরিবেশবিদদের প্রবল আপত্তি। জলসম্পদ উন্নয়নে উঁচু বাঁধগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে অন্তহীন বিতর্ক চলছে। ফলস্বরূপ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্য, যেগুলি হিমালয়ের নদীগুলি দ্বারা বিধৌত, সেখানে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলবিদ্যুতের অংশ যথাক্রমে মাত্র ৯ ও ৩ শতাংশ ; বাকিটা আসে তাপবিদ্যুৎ থেকে। আগামীদিনেও তাপবিদ্যুতের উৎপাদনের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০১০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৩.১০ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজন হবে বলে অনুমান করেছিলেন। নানা ধরনের হিসেব-নিকেশের ভিত্তিতে অনুমান করা হচ্ছে ২০১০, ২০২৫ ও ২০৫০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে যথাক্রমে ২.০০ লক্ষ হেমি, ৩.৩০ লক্ষ হেমি ও ৪.৫০ লক্ষ হেমি হল।

৪.৬। **অভ্যন্তরীণ জলপথ সংরক্ষণের জন্য জলের চাহিদা :**

৪.৬.১। পৃথিবীময় জ্বালানি সংকট এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল তৈলভাণ্ডার, তেল আমদানিতে বিদেশি মুদ্রার বিপুল প্রয়োজন ও পরিবেশ দূষণে সচেতনতার প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ জলপথগুলির গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করা হচ্ছে। ভগবতী কমিটি সারা দেশে ১২টি রাজ্যে ৫৬টি জলপথকে সম্ভাবনাময় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এর মধ্যে ১০টিকে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জলপথের মর্যাদা দিয়েছে। এই ১০টি জলপথের মধ্যে দুটি অর্থাৎ গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদী ও সুন্দরবনের নদীসমূহ—জাতীয় জলপথ বলে চিহ্নিত। ইতিমধ্যে গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি নদীপথ (কলকাতা-ফরাক্কা-এলাহাবাদ) ১নং জাতীয় জলপথ হিসেবে ঘোষিত।

৪.৬.২। জলপথ পরিবহনের জন্য কী পরিমাণ জল লাগবে তা নির্ভর করে উভয়মুখী জলযান যাতায়াতের জন্য নদী/খালকে কতটা নাব্য ও চওড়া করতে হবে তার উপর। জাতীয় পরিবহন নীতি সংক্রান্ত কমিটির (১৯৮০) সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় জলপথকে অন্তত পক্ষে ৪৫ মিটার চওড়া ও ১.৫ মিটার গভীর হতে হবে। এই জলপথ সংরক্ষণে কতটা জলপ্রবাহ/জলের প্রয়োজন তা জলপথের অত্যন্ত জটিল কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। ভিন্ন ভিন্ন জলপথের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ জলের প্রয়োজন, এমনকি এই জলপথের বিভিন্ন অংশে জলের প্রয়োজনের তারতম্য হতে পারে। গঙ্গা-ভাগীরথী-হুগলি জলপথের জন্য বৎসরে প্রায় ৩৫.৩০ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজন হবে। সুন্দরবনের নদীপথগুলি মূলত জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভরশীল এবং সেই কারণে উজান থেকে জলপ্রবাহের তেমন কোনও প্রয়োজন অনুভূত হবে না। জাতীয় কমিশন সারা দেশে ২০৫০ সাল নাগাদ ১৫ লক্ষ হেমি জলসম্পদের প্রয়োজন হবে বলে অনুমান করেছেন। এই পরিমাণ যথেষ্ট নয়। জাতীয় জলপথ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আরও কিছু জলপথ আছে যেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সম্প্রতি কলকাতার জল পরিবহনের জন্য ব্রিটিশ আমলে তৈরি খাল (চিৎপুর-কেষ্টপুর-ভাঙর কাটাখাল) উজ্জীবনের প্রয়াস রাজ্য সরকারের তরফে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ওড়িশা-কোস্ট ক্যানেল-হিজলী টাইডাল ক্যানালের পরিবহন ক্ষমতা বাড়িয়ে একটি কার্যকরী জলপথ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জলপথ সংরক্ষণের জন্য তাই এই রাজ্যে বৎসরে প্রায় ৪০.০০ লক্ষ হেমি জলের প্রয়োজন হবে ২০৫০ সাল নাগাদ।

৪.৭। **পরিবেশ রক্ষা ও প্রাণী সংরক্ষণের জন্য জলের প্রয়োজন :** পরিবেশ রক্ষায় জলের প্রয়োজন হয় দ্বিবিধ কারণে—(১) অরণ্যাচ্ছাদন সংরক্ষণের ও বন্যপ্রাণীর জন্য পানীয় জলের বরাদ্দ এবং (২) জলদূষণের মাত্রা কমানো ও পানীয় জলের মান বজায় রাখার জন্য। কতটা জল পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন তা হিসাব করার কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র নির্ধারিত হয়নি আজ পর্যন্ত। জাতীয় কমিশন সারা দেশে ২০১০ সালে ৫ লক্ষ হেমি, ২০২৫ সালে ১০ লক্ষ হেমি ও ২০৫০ সালে ২০ লক্ষ হেমি জল পরিবেশ রক্ষায় লাগবে বলে অনুমান করেছেন। নদীবহুলতার কারণে এবং প্রত্যেক নদীতেই একটি ন্যূনতম প্রবাহ রাখার স্বার্থে, পরিবেশ রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদের প্রয়োজন দেশের গড়পড়তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিবেশ রক্ষায় ১ লক্ষ হেমি বরাদ্দ রেখেছিল। সবদিক বিচার করে পরিবেশ রক্ষায় রাজ্যে আনুমানিক জলসম্পদের প্রয়োজন হবে ২০১০ সালে ০.৯০ লক্ষ হেমি, ২০২৫ সালে ১.২৫ লক্ষ হেমি ও ২০৫০ সালে ২.০০ লক্ষ হেমি।

৪.৮। **জলাধারগুলি থেকে বাষ্পীভূত জলসম্পদ :** কৃষিসেচ, পানীয় জল, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে তৈরি জলাধারগুলি থেকে (বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট) বেশ কিছু পরিমাণ জলসম্পদ বাষ্পীভূত হয়ে রাজ্য মোট ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

জাতীয় কমিশন বিভিন্ন আবহমণ্ডলে অবস্থিত জলাধারগুলির বাষ্পীভবনের মাত্রার একটি গড়পড়তা হিসেব করেছেন। বৃহৎ জলাধারগুলির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ব্যবহারযোগ্য সঞ্চিত সঞ্চয়ের ১৫ শতাংশ, মাঝারি ও ছোট জলাধারগুলির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ। দামোদর, কংসাবতী ও ময়ূরাক্ষী অববাহিকার জলাধার ও অন্যান্য ছোট মাঝারি জলাধারগুলি থেকে বৎসরে প্রায় ৮৩০০০ হেমি জলসম্পদ বাষ্পীভূত হয়ে থাকে। ময়ূরাক্ষী ও দামোদর অববাহিকার জলাধারগুলির অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে হলেও, এই বাষ্পীভবন রাজ্যের ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণকে যথেষ্ট কমিয়ে দেয়।

৪.৯। **অন্যান্য প্রয়োজনে জলের সম্ভাব্য চাহিদা :**

৪.৯.১। জলসম্পদ ব্যবহারের মূলক্ষেত্রগুলি ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টি প্রায়ই এড়িয়ে যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গবাদি পশুর জন্য পানীয় জলের চাহিদা। এর কোনও নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়াও রয়েছে বিনোদনের প্রয়োজনে জলসম্পদের ব্যবহার। বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্য এ দুটি ক্ষেত্রে জলের চাহিদা কত হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত দেননি। জাতীয় কমিশন অবশ্য গবাদি পশুর পানীয় জলের সম্ভাব্য চাহিদা অনুমান করতে গিয়ে মাথাপিছু দৈনিক ১৮ থেকে ৩০ লিটার জলের মাপকাঠি স্থির করেছেন। এই মাপকাঠির ভিত্তিতে রাজ্যে এই দুটি ক্ষেত্রে ২০১০ সাল, ২০২৫ সাল ও ২০৫০ সাল নাগাদ যথাক্রমে ০.৩৫ লক্ষ হেমি, ০.৪০ হেমি ও ০.৫০ হেমি জলের চাহিদা হবে বলে অনুমান করা যায়। এই চাহিদাটি আলাদা করে না দেখিয়ে পানীয় জল, গৃহস্থালি ও পৌর পরিষেবার জলের চাহিদার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হল।

৪.৯.২। কৃষি, সেচ, পানীয় জল, গৃহস্থালি ও পৌর পরিষেবা, শিল্পায়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে জলসম্পদ ব্যবহৃত হয় তার কিছু অংশ অব্যবহৃত অবস্থায় প্রকৃতিতে ফিরে আসে। কৃষি সেচে জোগান দেওয়া জলের কতটা অংশ অবব্যহৃত অবস্থায় ফিরে আসবে তা নির্ভর করবে ফসলের প্রকৃতি এবং সেচ ব্যবস্থা কতটা উন্নতমানের তার ওপর। সকলেই জানেন, এই রাজ্যে কৃষকেরা বহু ক্ষেত্রে ফসলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার করেন এবং মাঠে মাঠে সেচের জল সরবরাহের যে 'বানভাসি' পদ্ধতি চালু আছে তাতে জলের যথেষ্ট অপচয় হয়। অব্যবহৃত জলের কিছু অংশ ভূ-জলস্তরকে সমৃদ্ধ করে মাটির তলায় চুঁইয়ে এবং বাকি অংশ সেচসেবিত এলাকার অপেক্ষাকৃত নীচু অংশে, জলাশয়ে জমা হয় ও নদীবাহিত হয়ে সাগরে পড়ে। বর্তমানে সেচব্যবস্থার কার্যকারিতা ৪০ শতাংশের আশেপাশে অর্থাৎ সেচখাল মারাফৎ জোগান দেওয়া জলের প্রায় ৬০ শতাংশ অব্যবহৃত থেকে যায়। গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, মহানদী ও পেন্নার নদীর অববাহিকায়, যেখানে ধানই প্রধান শস্য বলে চিহ্নিত, অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে এই অব্যবহৃত জলের ৬০ শতাংশ জল পুনরায় ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে। ভূ-জলসম্পদ থেকে যে সেচের জোগান দেওয়া হয় সেখানে অবশ্য সেচব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেক বেশি। জলসম্পদ সংরক্ষণের ও সুষ্ঠু ব্যবহারের স্বার্থে দু-ধরনের সেচ ব্যবস্থারই কার্যকারিতা অনেক বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের জলসম্পদ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমান কার্যকারিতা ৪০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, ভূ-জলসম্পদ ব্যবহার করে যে সেচব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে তা বর্তমান ৭০ শতাংশ কার্যকারিতা থেকে ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-স্তরের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোগান দেওয়া জলসম্পদের যে অংশটুকু পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে তার আনুমানিক পরিমাণ ২০১০ সালে ৭.২৪ লক্ষ হেমি, ২০২৫ সালে ৭.৬৯ হেমি ও ২০৫০ সালে ৮.২০ লক্ষ হেমি।

৪.১০। **বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলসম্পদের সম্ভাব্য চাহিদার পরিমাণ :** উপরের বিস্তৃত আলোচনা থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রানুযায়ী জলসম্পদের চাহিদার পরিমাণ :

৪.১১। আগের আলোচনাটি অনেকগুলি অনুমানের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের উপরের জলের পরিমাণ যেমন অববাহিকা ধরে ধরে তৈরি করা হয়েছে, ভূ-জল পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে জেলাকে ভিত্তি করে এবং অববাহিকানুযায়ী পরিমাণ স্থির করা হয়েছে পরে।

৪.১২। ভূপৃষ্ঠের উপরের নদী, খাল ইত্যাদির জলের মোট পরিমাণের ৪০ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি নদীর অববাহিকা ছাড়া, অববাহিকা ভিত্তি করে জলসম্পদের জোগান ও সম্ভাব্য চাহিদা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। গাঙ্গেয় বা ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ক্ষেত্রে এই চাহিদা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে উপ-অববাহিকা ধরে জলসম্পদের জোগান ও চাহিদার পুনর্মূল্যায়ন

জলের চাহিদা (লক্ষ হেমি)

ব্যবহারের ক্ষেত্রে	২০১০	২০২৫	২০৫০
১। কৃষি সেচ	২৫.৭০	৩২.৯০	৩৫.৫০
২। পানীয় জল, গৃহস্থালি, পৌর পরিবেশ			
গবাদি পশু ও বিনোদন	৪.০০	৫.৩০	৮.২০
৩। শিল্প	৩.০০	৪.০০	৫.০০
৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন	২.০০	৩.৩০	৪.৫০
৫। অন্তর্দেশীয় জলপথ	৩৫.০০	৩৭.৫০	৪০.০০
৬। পরিবেশ রক্ষা ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ	০.৯০	১.২৫	২.০০
৭। জলাধারগুলি থেকে বাষ্পীভবন	০.৮৩	১.০০	১.০০
	৭১.৪৩	৮৫.২৫	৯৬.২০
৮। পুনর্ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ	(–) ৭.২৪	(–) ৭.৬৯	(–) ৯.২৮
	৬৪.১৯	৭৭.৫৬	৮৬.৯২
	বা ৬৪ লক্ষ হেক্টামিটার	বা ৭৮ লক্ষ হেক্টামিটার	বা ৮৭ লক্ষ হেক্টামিটার

করা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপরের জলের ব্যবহারযোগ্যতা ৪০ শতাংশ থেকে বাড়ানো যায় কিনা এর অনুসন্ধানও অত্যন্ত জরুরি। ভূ-জলের ক্ষেত্রেও, এই জলসম্পদকে দুটি ভাগ করা হয়েছে—(১) স্থিতিশীল ভূ-জলসম্পদ (২) পুনর্নবীকরণযোগ্য ভূ-জলসম্পদ। পশ্চিম-বঙ্গের ক্ষেত্রে প্রথমটির পরিমাণ বিপুল, প্রায় ১৬২৫ লক্ষ হেমি যেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য ভূজলসম্পদের পরিমাণ মাত্র ২০.৩৯ লক্ষ হেমি।

৪.১৩। চাহিদার পরিমাণ হিসেব করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে খাদ্যে সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবাদি জমির সম্ভাব্য আয়তন ধরা হয়েছে ১৯৯৯-২০০০ সালে রাজ্যে এ সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে এবং সারা ভারতে আবাদি জমির উর্ধ্বতম সীমা অর্থাৎ ১৪৩০ লক্ষ হেক্টরের কথা মনে রেখে।

৪.১৪। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কতকগুলি তথ্যের উপর নির্ভর করা অনুমান মাত্র। বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৮৪-৮৫ সালে যে কাজ করেছিলেন এই রাজ্যে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। আশা করি বিভিন্ন নদী অববাহিকাকে ভিত্তি করে এই কাজ শুরু হবে অচিরেই। ভবিষ্যতে জলসঙ্কটের চিত্রটির আভাস পাওয়া গেলেও, বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২৫ সাল নাগাদ যতটা ঘাটতি অনুমান করেছিলেন, অবস্থা ততটা আশঙ্কাজনক নয়।

৪.১৫। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদের জোগান ও চাহিদার মধ্যে সাজুয্য থাকবে ২০১৫ সাল পর্যন্ত। তারপরেই চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়তেই থাকবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ চাহিদা জোগান থেকে অন্তত পক্ষে ১৯ শতাংশ বেশি হবে। বলাই বাহুল্য, চাহিদা মাপা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এই রাজ্যের সম্ভাব্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে। কোনও কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আনুমানিক হারকে ছাড়িয়ে গেলে উপরের অঙ্কের হিসেব গরমিল হবার সম্ভাবনা। পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো না গেলে, জলের চাহিদার অভিক্ষিপ্ত মাত্রাও কম হবে। তবে সারাদেশে জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা যে সময়কালের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন অর্থাৎ ২০৫০ সালের চাহিদা জোগানকে যে ছাড়িয়ে যাবে তাতে দ্বিমত থাকার সম্ভাবনা কম।

৪.১৬। আলোচনাটি হল জাতীয় প্রেক্ষাপটে রাজ্য স্তরে। জলসম্পদ জোগানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের মতো ছোট রাজ্যেও আঞ্চলিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। ২নং সারণিতে রাজ্যের বিভিন্ন নদী অববাহিকাগুলি থেকে কি পরিমাণ জলসম্পদ পাওয়া যেতে পারে ও তার সম্ভাব্য চাহিদাটাই বা কি তার একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ২০৫০ সাল নাগাদ উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি থাকলেও, দক্ষিণবঙ্গের নদী অববাহিকাগুলির মধ্যে একমাত্র দামোদর ছাড়া অন্য নদী ও অববাহিকাগুলিতে এই অভাব প্রকট হবে। বিশেষ করে ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, রূপনারায়ণ ইত্যাদি নদীগুলির অববাহিকায়। পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অববাহিকায় ব্যাপক আর্সেনিক দূষণ, ভূ-জলসম্পদের ব্যবহার সীমিত করবে, বিশেষ করে পানীয় জল, গৃহস্থালি, শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর্সেনিক দূষণ, অতিমাত্রায় ভূজল উত্তোলনের পাশাপাশি রাজ্যের প্রায় ৬০টি ব্লকে (হাওড়ায় ৯টি, পূঃ মেদিনীপুরে ১৬টি, উঃ ২৪-পরগনায় ৫টি ও দক্ষিণ ২৪-পরগনায় ৩০টি) নোনাজলের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ও তার ফলে চাষবাসে ভূজলের ব্যবহার কমতে বাধ্য। এই সব আক্রান্ত ব্লকগুলিতে ভূপৃষ্ঠের উপরের জলের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করতে হবে, যদিও এই সব অঞ্চলে নদীবাহিত জলের ব্যবহারে কতকগুলি বাস্তব সমস্যা রয়েছে। বৃষ্টির জল ধরে জলের জোগান বাড়ানোর দিকে পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৪.১৭। পশ্চিমবঙ্গ একটি বন্যাপ্রবণ রাজ্য। এই রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ৪২ শতাংশ (৩৭৬৬০ বর্গ কিলোমিটার) বন্যাপ্রবণ বলে চিহ্নিত। বিগত কয়েক বৎসরের উপর্যুপরি বন্যার প্রকোপের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মানুষের বন্যা দুর্দশা থেকে কিছুটা মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে এই রাজ্যে জলসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন কিংবা সুষ্ঠু ব্যবহারের কোনও কর্মসূচিই রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। বলতে বাধা নেই ভারতবর্ষে জলসম্পদ নীতি প্রভাবিত হয় জলসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও সেচব্যবস্থার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তেমন কোনও অগ্রাধিকার পায়নি গত শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত। এই রাজ্যের জলসম্পদ নীতিও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুসারী ছিল। বিহার, অসম কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মতো বন্যাপ্রবণ রাজ্যে যে কোনও উন্নয়ন কর্মসূচিই বন্যা কিংবা নিকাশিব্যবস্থার বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের মতো বন্যাপ্রবণ রাজ্যে জলসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচিগুলি একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই বাস্তব অবস্থাটি অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায় এবং বিষয়গুলিকে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তাপবিদ্যুৎ ও বোরো চাষের স্বার্থে, দামোদর অববাহিকার জলাধারগুলিতে জল ধরে রাখার দাবি ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। ফলে, প্রাক বর্ষায় দামোদর-মুন্ডেশ্বরী-রূপনারায়ণ দিয়ে যে পরিমাণ জল ছাড়ার প্রয়োজন, এই নদীগুলির বহন ক্ষমতা বজায় রাখতে তা প্রায়ই ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতি, রূপনারায়ণ নদীর নিকাশি ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমছে, যা রাজ্যের এক বিরাট এলাকার বন্যা পরিস্থিতিকে সংকটময় করে তুলছে। অপরদিকে মধ্যবঙ্গের জেলাগুলিতে, মালদা ও মুর্শিদাবাদে, একদিকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য ব্যাপকভাবে নদীবাঁধ তৈরি করার ফলে, বন্যার জলে, বিভিন্ন নদীর প্লাবন অঞ্চলে ভূ-জলস্তর সমৃদ্ধ করার যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল ছিল তা অনেকটাই বিপর্যস্ত ; পাশাপাশি কৃষিসেচের জন্য এই সব জেলায় নলকূপের সাহায্যে ভূজলের অপরিমিত ব্যবহার, এই অঞ্চলে ব্যাপক আর্সেনিক দূষণের কারণ বলে অনেকেই মনে করেন।

৫। উপসংহার :

৫.১। উপরের আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত যুক্তিসঙ্গত অনুমিতি সমূহে আসা যায় :

৫.১.১। রাজ্যে ২০৫০ সাল নাগাদ জলসম্পদের চাহিদা, জোগান ছাড়িয়ে যাবে। সার্বিক ঘাটতি ১৫ থেকে ২০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫.১.২। ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ বর্তমান স্তরে বাড়ানো দুরূহ হলেও, অসম্ভব নয়। মোট জলসম্পদের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ ব্যবহারযোগ্য করার লক্ষ্যে

সম্ভাব্য প্রযুক্তি আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে। এর জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা।

৫.১.৩। জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে জলসম্পদ আহরণ করে তাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসকে সংহত করতে হবে। এর জন্য রাজ্যস্তরে যথেষ্ট সদিচ্ছা এবং জনমানসে জলসম্পদের উত্তরোত্তর ঘাটতির বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

৫.১.৪। জলকে জাতীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য করতে হবে এবং এর ব্যবহার সামগ্রিকভাবে জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবেই করতে হবে।

৫.১.৫। সংবিধানের ৭৩ এবং ৭৪ নং সংশোধনী অনুসারে কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পনা থেকে রূপায়ণের ক্ষমতা জেলাস্তরে ন্যস্ত হয়েছে। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ প্রকল্প ও বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি এই সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও, বিশেষ কিছু কর্মসূচি রূপায়ণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের হাতে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এই ধরনের প্রবণতা জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। এক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ভার পঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করা যেতে পারে।

৫.১.৬। এই রাজ্যে মোট ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের সিংহভাগই রয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতে। জলসম্পদের ব্যবহারের দিক থেকে এই অঞ্চল অনেকটা পিছিয়ে। জলসম্পদের জোগান ও ব্যবহারের এই বৈষম্য, ভবিষ্যতে রাজ্যের সামগ্রিক চাহিদা মেটানোর পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

৬। ভবিষ্যতে জলসম্পদ ও এর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে যে সমস্যাগুলি দেখা দেবে তাদের সম্ভাব্য চিত্র নীচে দেওয়া হল :

৬.১.। জাতীয়স্তরে ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের গড়পড়তা মাথাপিছু বাৎসরিক জোগান বর্তমান ১০৫৭ ঘনমিটার (২০০১) থেকে কমে ২০৫০ সালে দাঁড়াবে ৭৪৩ ঘনমিটার। সাম্প্রতিকতম তথ্যানুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাদ্বয় ৯১০ ও ৬৫০ ঘনমিটার। জনস্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নয়নের স্বাভাবিক হার বজায় রাখতে হলে

সারণি—১

পশ্চিমবঙ্গের নদী অববাহিকা/উপ-অববাহিকায় জলসম্পদের মোট জোগান

(লক্ষ হেক্টা মিটার)

ক্রমিক সংখ্যা	নদী অববাহিকা/ উপ-অববাহিকা	জলসম্পদ জোগানের উৎস					
		মোট জলসম্পদের পরিমাণ			ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ		
		ভূপৃষ্ঠের উপরের জল	ভূজল (পুনর্নবীকরণ যোগ্য)	মোট	ভূপৃষ্ঠের উপরের জল	ভূজল	মোট
১।	সঙ্কোশ	১.৩৬৫	০.০৫৬	১.৪২১	০.৫৪৬	০.০৫৬	০.৬০২
২।	রায়ডাক	৬.৬৬৭	০.৩৪৪	৭.০১১	২.৬৭০	০.৩৪৪	৩.০১৪
৩।	তোর্ষা	১১.৯০৮	১.৮১৩	১৩.৭২১	৪.৭৬০	১.৮১৩	৬.৫৭৩
৪।	জলঢাকা	১২.৬৬৫	১.১৫১	১৩.৮১৬	৫.০৬৬	১.১৫১	৬.২১৭
৫।	তিস্তা	৩২.১২৪	০.৬১৪	৩২.১৮৫	২.৮৫০	০.৬১৪	১৩.৪৬৪
৬।	মহানন্দা	১৩.৩৩৪	১.৯৯৫	১৫.৩২৯	৫.৩৩৪	১.৯৯৫	৭.৩২৯
৭।	পুনর্ভবা	১.০৩৪	০.২৯৫	১.৩২৯	০.৪১৪	০.২৯৫	০.৭০৯
৮।	আত্রেয়ী (আত্রাই)	০.৪৮৭	০.২৪১	০.৭২৮	০.১৯৫	০.২৪১	০.৪৩৬
৯।	পাগলা-বাঁশলই	০.৫৯১	০.২২৬	০.৮২৭	০.২৩৬	০.২২৬	০.৪৬২
১০।	ময়ূরাক্ষী	২.৫৯০	১.১১৭	৩.৭০৭	৩.০৩৬	১.১১৭	২.১৫৩
১১।	দামোদর	৮.৯২৪	১.২২৮	১০.১৫২	৩.৫৭০	১.২২৮	৪.৭৯৮
১২।	দারকেশ্বর-গন্ডেশ্বরী	৩.৩৩০	০.৮৯৩	৪.২২৩	১.৩৩২	০.৮৯৩	২.২২৫
১৩।	অজয়	২.৫০৯	১.১৩৪	৩.৬৪৩	১.০০৩	১.১৩৪	২.১৩৭
১৪।	শীলাবতী	২.০৬৮	১.০০০	৩.০৬৮	০.৮২৭	১.০০	১.৮২৭
১৫।	ব্রাহ্মণী-দ্বারকা	১.৯৫৭	০.৮৮০	২.৮৩৭	০.৯৮৩	০.৮৮০	১.৬৬৩
১৬।	কংসাবতী	৩.২৩০	০.৯১৪	৪.১৪৭	১.২৯৩	০.৯১৪	২.২০৭
১৭।	কালিয়াঘাই	০.৮১৮	০.৩৫৪	১.১৭২	০.৩২৭	০.৩৫৪	০.৬৮১
১৮।	জলঙ্গী-চূর্ণী	৩.৭০৭	১.৩৫০	৫.০৫৭	১.৪৮৩	১.৩৫০	২.৮৩৩
১৯।	ভাগীরথী	১৩.৬৪৩	৩.৩৭০	১৭.০১৩	৫.৪৫৭	৩.৩৭০	৮.৮২৮
২০।	রূপনারায়ণ	১.১৮৮	০.০৮৮	১.২৭৬	০.৮৭৫	০.০৮৮	০.৫৬৩
২১।	সুবর্ণরেখা	৩.৬৪৫	০.৩৩৭	৩.৯৮২	১.৪৬০	০.৩৩৭	১.৭৯৭
২২।	উঃ ও দঃ ২৪-পরগনার নিকাশি অববাহিকা	৩.৯২৭	০.৮৯৫	৪.৮২২	১.৫৭২	০.৮৯৫	২.৪৬৭
২৩।	পিছাভাঙ্গা	০.৪৬২	০.৪০০	০.৮৬২	০.১৮৪	০.০৬১	০.২৪৫
২৪।	রসুলপুর	০.৪০১	০.০৫৫	০.৪৫৬	০.১৬০	০.০৫৫	০.২১৫
২৫।	হলদী	০.৩২৭	০.০০১	০.৩২৮	০.১৩১	০.০০১	০.১৩২
	মোট	১৩২.৯০৫	২০.৩৯	১৫৩.২৯৫	৫৩.১৬	২০.৩৯	৭৩.৫৫

ন্যূনতম মাপকাঠি হচ্ছে ৯০০ থেকে ১০০০ ঘনমিটার।

৬.২। নানাবিধ কারণে জলদূষণের প্রমাণ আরও বেশি বেশি করে পাওয়া যাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই দূষণের মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে—নতুন নতুন শহরের পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদাই এর অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

৬.৩। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃরাজ্য নদীগুলির জলসম্পদের ব্যবহার নিয়ে একই অববাহিকার অন্তর্গত রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ ও তিক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এই বিরোধের অন্যতর মাত্রাও আছে। নগরায়ণের প্রয়োজনে জলের চাহিদা স্থানীয়ভাবে মেটানো দুষ্কর হওয়ার ফলে দূরবর্তী স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দীকৃত জল নিয়ে আসার দরকার হবে। এর ফলে আবার বৃহত্তর গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক স্থিতিকে বিপর্যস্ত করে একটি স্থায়ী বিরোধের সূচনা হবে।

৬.৪। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে জলসম্পদ ব্যবহারের বর্তমান বিপুল বৈষম্য ভবিষ্যতে

সারণি—২

পশ্চিমবঙ্গের নদী অববাহিকাগুলিতে জলসম্পদের জোগান ও সম্ভাব্য চাহিদা (আংশিক)

(লক্ষ হেক্টা মিটার)

ক্রমিক সংখ্যা	নদী অববাহিকা	মোট ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ	চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলসম্পদের সম্ভাব্য চাহিদা			
			কৃষি	পানীয় জল, গৃহস্থালির	শিল্প ও বিদ্যুৎ	
১।	সঙ্কোশ**	০.৬০২	০.০৭০	০.০০৮	০.০০৭**	** বাংলাদেশের চাহিদা ধরা হয়নি।
২।	রায়ডাক**	৩.০১৪	০.৪১০	০.০৫	০.০৬০**	
৩।	তোর্ষা	৬.৫৭৩	১.৩০০	০.১৯	০.২২০**	
৪।	জলঢাকা**	৬.১২৭	১.৫২০	০.১৯	০.১৩৫**	
৫।	তিস্তা**	১৩.৪৬৪	০.৬৬৭	০.১০	০.১৭০**	
৬।	মহানন্দা	৭.৩২৯	৪.১৫৮	০.৬১	০.৪৫০**	
৭।	পুনর্ভবা	০.৭০৯	০.৫৫০	০.০৭	০.০৩০	
৮।	আত্রেয়ী (আত্রাই)	০.৪৩৬	০.৩৭০	০.০৫	০.০২৫	
৯।	পাগলা-বাঁশলই	০.৪৬২	০.৩৩০	০.০৬	০.০৩০	
১০।	ব্রাহ্মণী-দ্বারকা	১.৬৬০	১.২৪০	০.২২	০.১০০	** ঝাড়খন্ড ও বিহারের চাহিদা ধরা হয়নি।
১১।	ময়ূরাক্ষী	২.০৪১	১.১৩০	০.৪০	০.৪০০**	
১২।	অজয়	২.১৩৭	১.১৫০	০.৪০	১.০০০**	
১৩।	দামোদর	৪.৭৯৮	২.০৬৬	০.৬৯	১.৫০০	
১৪।	দারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরী*	২.২২৫	১.৮৫০	০.৪০	০.৪৫০	
১৫।	শীলাবতী	১.৮২৭	১.৭০০	০.৪২	০.২০০	
১৬।	কংসাবতী	২.২০৭	২.২১৫	০.৪৮	০.৬০০	
১৭।	কালিয়াঘাই	০.৬৮৯	১.১১৭	০.১৯৬	০.০৬০	
১৮।	জলঙ্গী-চূর্ণী	২.৮৩০	২.১৭০	০.৪৩৭	০.২০০	
১৯।	ভাগীরথী	৮.৮২৮	৮.০৬০	১.৯০	২.১০০	
২০।	রূপনারায়ণ	০.৫৬৩	০.৬০৩	০.২৯৬	০.৬০০	
২১।	সুবর্ণরেখা	১.৭৯৭	১.৩৩০	০.৪০	০.৭৫০	
২২।	উঃ ও দঃ ২৪-পরগনা নিকাশি	২.২৪৬	১.৭৭০	০.৩৩৬	০.২৩০	
২৩।	পিছাভাঙ্গা নিকাশি	০.২৪৬	০.৫৬০	০.১১২	০.০৪০	
২৪।	রসুলপুর	০.২১৫	০.৪৯৫	০.১৪	০.০৭০	
২৫।	হলদী	০.১৩২	০.৪০০	০.০৪৫	০.১০০	

বিঃ দ্রঃ—বিভিন্ন নদী অববাহিকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা অনুমান করা হয়েছে। অববাহিকা ভিত্তিক চাহিদা একমাত্র কৃষিক্ষেত্র ছাড়া কোনও ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। একটি আনুমানিক হিসেব দেওয়া হল, বিশেষজ্ঞ কমিটির তৈরি প্রাথমিক হিসেবের ওপর ভিত্তি করে।

জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল।

৬.৫। যথেষ্ট তথ্য ভিত্তি তৈরি, নদী-প্রবাহ ও ভূ-জলস্তরের নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন, স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে জলসম্পদের (ভূ-পৃষ্ঠের উপরের ও ভূ-জল) সুসংহত ব্যবহারের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক নদীগুলির উপরে দেশ ও রাজ্যের সীমানার বাইরে জলাধার নির্মাণ এবং পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধা বিচার করে জলসম্পদের অববাহিকান্তরন-এর মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে। পাশাপাশি জলবিভাজিকা উন্নয়ন, জলসম্পদের সংরক্ষণ, বৃষ্টির জল ধরে রাখা, ভূ-জলস্তরের সমৃদ্ধির কর্মসূচিগুলি, জলসম্পদের জোগান বাড়ানোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে। এই কর্মসূচিগুলির সফল রূপায়ণের জন্য কতকগুলি নিয়মনীতি তৈরি করা এবং তাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে এই কর্মসূচিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা পরিচালিত ও রূপায়িত হয়ে থাকে। সুসংহত ব্যবহারের পথে এটি একটি বড় অন্তরায়। রাজনৈতিক সদিচ্ছা তৈরি না হলে এই লক্ষ্যে পৌঁছনো প্রায় অসম্ভব।

৬.৬। আন্তঃ অববাহিকান্তরন ঘাটতি অঞ্চলে জলসম্পদের পরিমাণ বাড়ানোর পক্ষে সহায়ক হলেও, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উদ্বৃত্ত জল গঙ্গা অববাহিকার অন্তর্গত অন্যান্য ঘাটতি উপঅববাহিকার যে কোনও প্রকল্পই পরিবেশগত কারণে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবে।

৬.৭। রাজ্যের জলসম্পদের অনেকটাই আন্তর্জাতিক নদীগুলির মাধ্যমে পাওয়া যায়, যেগুলি একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে উৎসারিত হয়ে আরেকটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে সাগরে গিয়ে মেশে। কোনও কোনও নদী আবার আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর বয়ে চলে। জাতীয় ও আঞ্চলিকস্তরে কোনও সুসংহত পরিকল্পনা এই বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে পারে না। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিশ্বাসের পরিমণ্ডল তৈরি করে লেনদেনের ভিত্তিতে জলসম্পদের বাড়তি জোগান ও জলবিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে জলসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা আনা ও আন্তর্জাতিক স্তরে তথ্য আদানপ্রদানের বিষয়টি আরও উন্মুক্ত করা যায় কিনা তা ভেবে দেখবার সময় এসেছে। জলের গুণগতমান, আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর নদীগুলির ক্রমাগত গতিপথ পরিবর্তন, বাঁধ সুরক্ষা এবং প্রকল্প এলাকায় বাস্তুচ্যুত ও অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসনে সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠি তৈরি করা, প্রকল্প রূপায়ণ ব্যয় ভাগাভাগি করার বিষয়গুলি নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি বোঝাপড়ার বাতাবরণ তৈরি করার সময় এসেছে।

৬.৮। জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের ও অপচয় রোধের লক্ষ্যে কতকগুলি কার্যকরী প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলির আর্থিক দিকটাও যথেষ্ট সন্তোষজনক। এগুলি কাজে লাগিয়ে কয়েকটি উন্নত দেশ সুফল লাভ করেছে। এই প্রযুক্তিগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে পুরাতন সেচ প্রকল্পগুলির পুনর্বাসন,

বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষের ক্ষেত্রের আয়তন নির্ণয় করা এবং তদনুযায়ী মাঠ নালার মাপ ঠিক করা যাতে সেচের প্রয়োজনাতিরিক্ত জলসম্পদের অপচয় না ঘটে, চাষে ঝরনা সেচ ও বিন্দু সেচ চালু করা, সেচ খালগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করা, আবহাওয়ার উপরে ভিত্তি করে শস্য ফলনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সেচব্যবস্থার সময়সূচি পরিবর্তন, শিল্প ও পৌর পরিষেবায় ব্যবহৃত জল শোধন করে পুনর্ব্যবহার। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রচুর অর্থের সংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

৬.৯। জলসম্পদ ব্যবহারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আবার একটি যথাযথ জাতীয় জলসম্পদনীতি নির্ভরশীল। জলসম্পদের উপর ঐতিহাসিক অধিকার ও দেশের আইনি-ব্যবস্থা, এই সম্পদ ক্ষেত্রে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, সম্পদ সংরক্ষণকে উৎসাহিত ও অপচয়কে নিরুৎসাহিত করতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ, সেচ ব্যবস্থাপনায় মহিলাসহ উপভোক্তাদের অংশগ্রহণ, জল বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও নিকাশি ব্যবস্থার রূপায়ণ, সম্পূর্ণ হওয়া সেচব্যবস্থা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ, গৃহস্থালি ও শিল্পের জন্য বরাদ্দীকৃত জলের গুণগত মান বজায় রাখা, পরিবেশ-গত ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজনসহ নানা বিষয়ে মাপকাঠি তৈরি করা, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে উপভোক্তা- দের দায়িত্ব নির্ধারণ ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। যদিও জলসম্পদের ব্যবহারের একই মাপকাঠি সর্বত্র প্রয়োজন কিংবা কাম্য নয় তবু একটি বহুজনগ্রাহ্য ন্যূনতম মাপকাঠি প্রণয়ন না করলে, জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

৬.১০। ভূমিক্ষয়, অরণ্যসংহার, সেচ-সেবিত এলাকার অপর্যাপ্ত নিকাশি ভূজলের অপরিমিত ব্যবহার, জল ও বায়ুদূষণ, জলবাহিত রোগ এবং সেচ প্রকল্প দ্বারা বাস্তুচ্যুত ও অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত পরিবেশগত সমস্যা, চাহিদা ও জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৬.১১। একইভাবে জলসম্পদ উন্নয়নের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি হল, রাজ্য ও কেন্দ্রের দায়িত্ব ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ১৯৫৬ সালে রিভার বোর্ড আইন, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক স্তরে জলবন্টনের সমস্যা, জলদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন। জমির মালিকানার সঙ্গে জমির নীচের ভূ-জলের উপর স্বত্ব এবং নদীর জলের উপর অববাহিকার মানুষদের অধিকারের বিষয়গুলিও পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

৬.১২। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু নদী অববাহিকার জলসম্পদের আরও সুষ্ঠু ব্যবহারের স্বার্থে জলবায়ুর সাম্প্রতিক প্রবণতা বিশ্লেষণ ও তার সম্ভাব্য প্রভাব এবং সেগুলি মোকাবিলা করার কর্মসূচি রচনা করার জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এই সব ক্ষেত্রে, বলার অপেক্ষা রাখে না যে দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যানধারণা অনেকটাই প্রভাবিত হবে। তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে প্রতিটি রাষ্ট্র যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকে সে সব শিথিল না করলে, আন্তর্জাতিক অববাহিকা-গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার এ পর্যন্ত অব্যবহৃত জল-সম্পদের সুসংহত ব্যবহারের বিষয়টি অনেকটাই অধরা থেকে যাবে।

পীযূষকান্তি বসু □ প্রাক্তন সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর অববাহিকা / উপ-অববাহিকা

ক. ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা :

♦ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার সঙ্কোশ নদীর উপ-অববাহিকা ♦ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার রায়ডাক নদীর উপ-অববাহিকা ♦ জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার তোরসা নদীর উপ-অববাহিকা ♦ দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলার জলঢাকা নদীর উপ-অববাহিকা ♦ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা নদীর উপ-অববাহিকা।

খ. গঙ্গা-ভাগীরথী অববাহিকা :

♦ দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার মহানন্দা নদীর উপ-অববাহিকা ♦ দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার পুনর্ভবা নদীর উপ-অববাহিকা ♦ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার আত্রেয়ী নদীর উপ-অববাহিকা ♦ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাগলা, বাঁশলই নদীর উপ-অববাহিকা ♦ বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ব্রাহ্মণী, দ্বারকা নদীর উপ-অববাহিকা ♦ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার ময়ূরাক্ষী নদীর উপ-অববাহিকা ♦ বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয় নদের উপ-অববাহিকা ♦ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, ও হাওড়া জেলার দামোদর নদের উপ-অববাহিকা ♦ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার দ্বারকেশ্বর নদীর উপ-অববাহিকা ♦ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ও মেদিনীপুর জেলার শিলাবতী নদীর উপ-অববাহিকা ♦ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার কংসাবতী নদীর উপ-অববাহিকা ♦ মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর উপ-অববাহিকা, ♦ মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার জলঙ্গি নদীর উপ-অববাহিকা ♦ নদিয়া জেলার চূর্ণি নদীর উপ-অববাহিকা ♦ মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাগীরথী-হুগলি নদীর উপ-অববাহিকা ♦ হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণ নদীর উপ-অববাহিকা।

গ. সুবর্ণরেখা অববাহিকা :

পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা অববাহিকা।

নিকাশি ও বন্যাজনিত সমস্যায় জলপাইগুড়ি শহর

প্রদীপলাল ব্যানার্জি

বর্ষাকাল মানেই জলপাইগুড়ি শহরবাসীর কাছে একটা আতঙ্ক। অজানা কিছু ঘটার আশঙ্কায় তারা শঙ্কিত হয়ে দিন কাটায়। এর কারণ আছে। কারণটা আর কিছুই নয়। ১৯৬৮ সালের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। যে শিশুটি সেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল সে আজ যুবক, যুবকেরা আজ বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছে আর বৃদ্ধেরা যাঁরা বেঁচেআছেন এখনও তাঁদের স্মৃতিতে আছে সেদিনের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

১৯৬৮ সালের জলপাইগুড়ির বন্যার কথা সবাই জানেন, তাই এখানে আর তার বিস্তৃত আলোচনা না করে খুব সংক্ষেপে জানাই যে, সে বছর দুর্গাপুজোর পরেই দ্বাদশীর দিন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। লক্ষ্মীপুজো ছিল অক্টোবরের চার তারিখে। আগের দিন সন্ধে থেকেই নামে মুষলধারায় বৃষ্টি। যদিও এ ধরনের বৃষ্টি জলাপাইগুড়ি শহরের মানুষের গা-সওয়া ব্যাপার তাই বেশির ভাগ বাড়িতেই পরদিনের লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন করে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু কে জানত, সেবারের লক্ষ্মীপুজো আর জলপাইগুড়ির কোনো বাড়িতে হবে না।

কেননা মাঝরাতে (খুব সম্ভব রাত আড়াইটে নাগাদ) সবার ঘুম ভেঙে যায় এক ভয়াবহ শব্দে। দরজা খুলতেই দেখে হু হু করে বরফঠাণ্ডা জল ঢুকছে ঘরের মধ্যে। তখনও কেউ জানে না যে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের উল্টোপাড়ে তিস্তার দোমোহনির বাঁধ ভেঙে গেছে। এবং এরপরেই তিস্তার জলের তোড়ে শহরের কাছে রংধামালিতে তিস্তার বাঁধ ভেঙেও শহরে জল ঢুকতে শুরু করে। জলপাইগুড়িতে তখন বেশির ভাগ বাড়িই ছিল একতলা। দোতলা বাড়ির সংখ্যা হাতে গুনে বলা যেত। এবং বহু বাড়িই ছিল টিনের চালের। সে রাতে যে যে-অবস্থায় ছিল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব চালের ওপরে আশ্রয় নেয়। বহু মানুষ ও শিশু জলের তোড়ে ভেসে যায়। যাদের বাড়ি দোতলা তারা দোতলায় চলে যায়। সে এক অকল্পনীয় দৃশ্য।

বৃষ্টির তোড় কমে যায় এবং পরের দিন সকাল থেকে আস্তে আস্তে জলও কমতে শুরু করে। কিন্তু কমলে হবে কী, জলের সঙ্গে ভেসে আসছিল তখন কচুরিপানা, বিষধর সাপ, গরু-মোষ ও মানুষের শবদেহ। সেই সঙ্গে পলি জমা হয়ে যায় সারা জলপাইগুড়ি শহরে। যারা চালার ওপরে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের স্থানীয় কোনো উঁচু বাড়ি বা কোনো স্কুলবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর দেখা যায় খাদ্যাভাব। কেননা সমস্ত খাদ্যের গুদামগুলোতে জল ঢুকে চালডাল সব নষ্ট করে দেয়। ফলে শিলিগুড়ি শহর থেকে ত্রাণ আসতে শুরু করে। অন্যদিকে কয়েকদিনের মধ্যেই কলেরা ইত্যাদি রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। অনেকে জলপাইগুড়ি ছেড়ে শিলিগুড়ি শহরে আশ্রয় নেয়। জলপাইগুড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে, যা ঠিক হতে বহু বছর লেগেছিল।

১৯৬৮ সালের জলপাইগুড়ি শহরের বন্যার কারণ কী ! অনুসন্ধান করতে গিয়ে বহু সমীক্ষক দল এসেছেন এবং নানা ধরনের সমীক্ষার পর দেখা যায় যে সিকিমের কোনো এক অংশে পাহাড়ি জল জমা হয়ে একটা কৃত্রিম সরোবর তৈরি করে বেশ কয়েকদিন ধরে। হঠাৎ এই সরোবর ভেঙে যায় এবং তার ফলে তিস্তা একটা বিরাট জলপ্রবাহ (Discharge) নিয়ে নীচে নেমে আসে। আর এরপর থেকেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় জল আয়োগ (Central Water Commission) তাদের কাজের পরিধি সিকিম পর্যন্ত বিস্তৃত করে এবং এর ফলেই বর্তমানে অনেক আগের থেকে সব খবর জানা যায়।

এসব বহুদিন আগের কথা। কিন্তু তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি আজও অনেক জলপাইগুড়িবাসীর মনে জ্বলজ্বল করছে। এবারে বর্তমান সমস্যার দিকে চোখ ফেরানো যাক। বর্ষায় জলপাইগুড়িবাসীর কাছে সমস্যা কী ? এই সমস্যা হল দুটি :

নিকাশিজনিত সমস্যা

জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দারা এ সমস্যায় বহুদিন ধরেই ভুগছে। শহরটা একটা বাটির মতো বলে স্বল্প বৃষ্টিতেই এখানে বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে যায়। যেমন পাণ্ডাপাড়া, শান্তিপাড়া, মহামায়াপাড়া। এখনও এসব জায়গা বর্ষায় দিনের পর দিন জলে ডুবে থাকে। রাস্তা ছাড়াও জনবসতিতে জল ঢুকে যায়। অতিবৃষ্টিতে বহু অঞ্চল দিনের পর দিন জলমগ্ন হয়ে থাকে। এখানে বৃষ্টিপাত বছরে গড়ে ৩৫০০ মিমি। ১৯৯৯ সালে একদিনে বৃষ্টি হয়েছে ৪৮০ মিমি। কয়েক বছর আগেও এক বছরে ৪২০০ মিমি বৃষ্টিপাতহয়েছে। এ ছাড়াও আছে শহরের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া করলা নদী এবং করলার শাখানদী ধরধরা কখনও যদি উপচে পড়ে তাহলে আরও সোনায় সোহাগা। এ নিয়েই জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা বেঁচে আছেন।

সমাধান

যদিও নিকাশিজনিত সমস্যা, তবুও এর দায়িত্ব মূলত উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগকেই নিতে হয়। কেননা স্থানীয় পৌরসভার সেরকম কোনও পরিকাঠামো নেই। সমাধান খোঁজার পথ বহুদিন ধরেই চলেছে। কেননা স্থানীয় জনসাধারণও দিন দিন অধৈর্য হয়ে পড়ছে। এ নিয়ে বহু আলোচনাসভাও বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে। এর সঙ্গে জানিয়ে রাখা ভালো যে জলপাইগুড়ি শহরের নিকাশিজনিত সমস্যার সমাধানে প্রতিটি মানুষ দলমত নির্বিশেষে আগ্রহী, এ ছাড়া প্রশাসনিক দপ্তর, জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং অন্যান্য সরকারি অফিসগুলোও এর সমাধানে সমান আগ্রহী। উত্তরবঙ্গ বন্যা-নিয়ন্ত্রণ আয়োগ (N.B.F.C.C) থেকে 'জলপাইগুড়ি শহরের নিকাশি অবরোধ দূরীকরণ' (Removal of drainage Congesation in Jalpaiguri Town) নামে একটা ৯৮ লক্ষ টাকার স্কিম করা হয়েছিল এবং খুব সম্ভব ১৯৯৫ সালের কারিগরি উপদেষ্টা পর্ষদ (B.T.C) আলোচনাসভায়

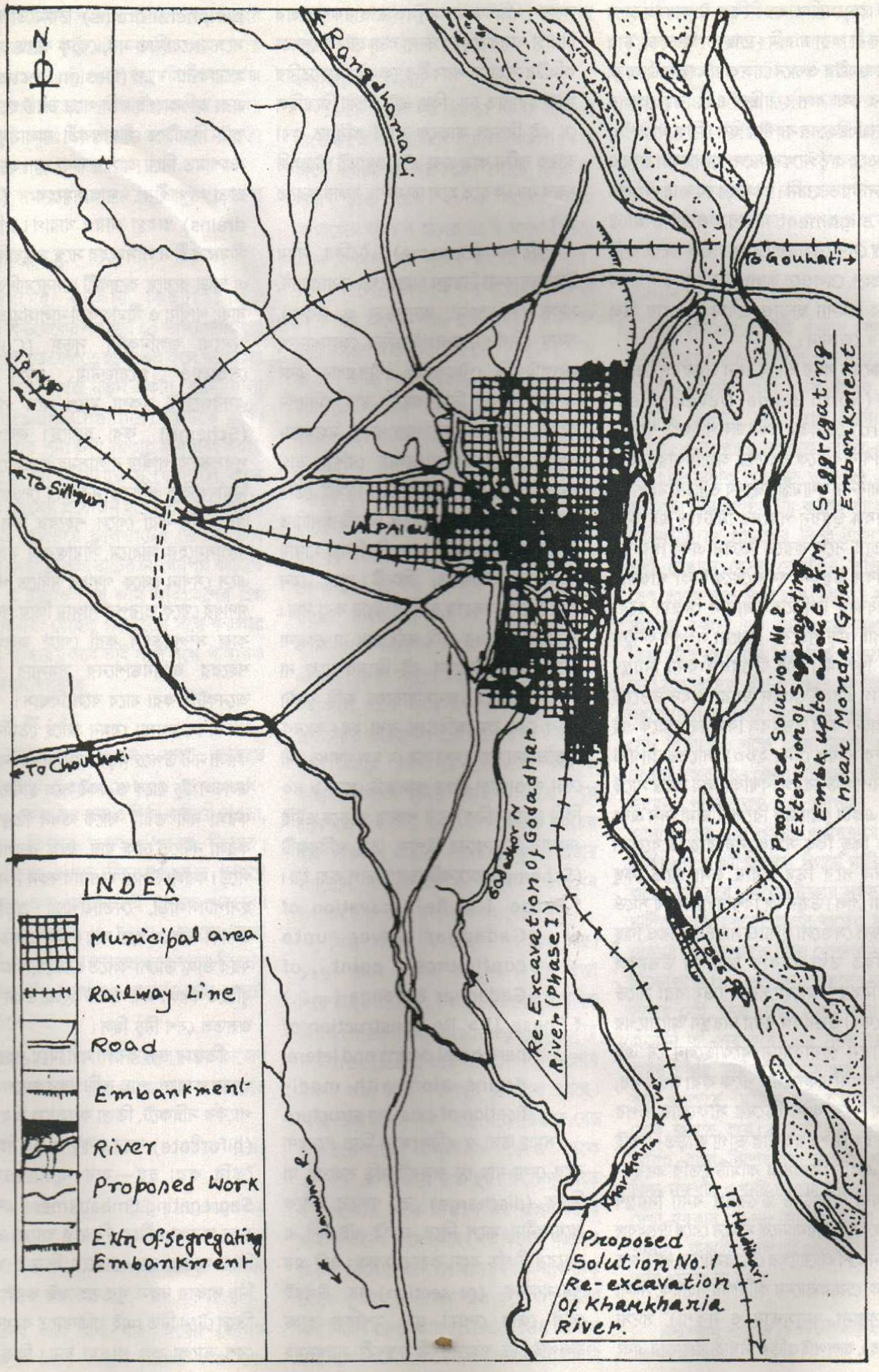

N
Rangdhamali
Godadhar N
Re-Excavation of Godadhar River (Phase I)
To Gouhati
Seggregating Embankment
Proposed Solution No. 2 Extension of Seggregating Embk. upto about 3 K.M. near Mondal Ghat
To Siliguri
To Chouhati
JALPAIGURI
Jamuna R.
Kharkharia River
To Haldibari
Proposed Solution No. 1 Re-excavation of Kharkharia River.
INDEX
Municipal area
Railway Line
Road
Embankment
River
Proposed Work
Extn Of Segregating Embankment

সেটি অনুমোদিত হয়। কিন্তু টাকার অভাবে কার্যকরী করা যায়নি। তাছাড়া শুরুতেই চার নম্বর গুমটির ওখানে রেলওয়ে কালভার্ট চওড়া করার কথা বলা হয়েছিল এবং কিছু রেলের জমি অধিগ্রহণের ব্যাপার ছিল। কিন্তু মালিগাঁও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি। তা ছাড়া যে জায়গাগুলো দিয়ে alignment যাবার কথা ছিল, আস্তে আস্তে সেখানে ঘরবাড়ি হতে শুরু করে। জমি অধিগ্রহণ, রেলওয়ে কালভার্ট চওড়া করা এসব বাস্তব সমস্যা ছাড়াও প্রধান অন্তরায় ছিল টাকার জোগান।

কয়েক বছর আগে যখন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ (North Bengal Development Board) তৈরি হয় তখন জলপাইগুড়ি শহরের নিকাশি ব্যবস্থাকে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের মিটিংয়ে এই কাজ দ্রুততার সঙ্গে করতে বলেন এবং স্থির হয় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ থেকে টাকা পাওয়ার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জোগান দেওয়া হবে। জলপাইগুড়ি শহরের কোনো সম্পূর্ণ কনটুর ম্যাপ ছিল না। তাই উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগ এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ উভয়েই আলোচনা করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই কাজের দায়িত্ব দেন। ২০০১ সালের আগস্ট মাস নাগাদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত সার্ভে করে একটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট জমা দেন এবং তাতে কিছু কিছু সমাধানের রাস্তাও বলেন। এতদিন পরে স্কিম করার জন্য হাতে কিছু পাওয়া গেল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যে সার্ভে করেছিল সেগুলো ছাড়াও সার্ভের আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য দরকার ছিল, যা উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের সার্ভেয়াররা সার্ভে করে দেন। উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের তদানীন্তন চেয়ারম্যান বুঝেছিলেন যে এই স্কিম কোনো একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে যখন স্কিমের সাফল্যের ওপর জলপাইগুড়ি শহরবাসীর ভাগ্য জড়িত—তাই তিনি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের চেয়ারম্যানকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত সহায়ক, চেয়ারম্যানের কারিগরি সহায়ক, সদস্য (পরিকল্পনা, অনুসন্ধান ও নকশা), সদস্য (নির্বাহ), জলপাইগুড়ির নির্বাহী বাস্তকার এবং সদস্য (পরিকল্পনা, অনুসন্ধান ও নকশা)-এর নির্বাহী বাস্তকারদের সদস্য করা হয়। বিশেষজ্ঞ কমিটির সাহায্যে পরবর্তীকালে এই স্কিম তৈরির কাজ ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু এটা বোঝা গিয়েছিল যে এই বিশাল কাজকে কার্যে পরিণত করা আরও কঠিন কাজ এবং এটা কিছুতেই চটজলদি সম্ভব নয়। করতে হলে তা দফায় দফায় করতে হবে।

পরিকল্প (Scheme) তৈরির সময় উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের চেয়ারম্যান, সদস্য (পরিকল্পনা, অনুসন্ধান ও নকশা), সদস্য (নির্বাহ), জলপাইগুড়ির জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি পৌরসভার পৌরপ্রধান এবং অন্যান্য বহুবার নির্মাণকার্যের স্থান পরিদর্শন করেন, বিশেষ করে পাণ্ডাপাড়া, মহামায়া-তলার যেসব জায়গাগুলোয় বেশির ভাগ সময়েই জল জমা হয়ে থাকে। স্কিমটি তৈরি করার সময় বাস্তবভাবে যাতে স্কিমটি রূপায়িত করা যায় তার জন্য কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা হয়। প্রথমত, স্কিমটি করে যেন জলনিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান করা যায়। দ্বিতীয়ত, রেলের জমি অধিগ্রহণ বা কোনো রেলের স্ট্রাকচার যেন এই স্কিমের মধ্যে না আসে। তৃতীয়ত, জনসাধারণের জমি যতটা সম্ভব যেন কম অধিগ্রহণ করা হয়। অনেক চিন্তাভাবনা করে দেখা যায় যে মূল গদাধর নদী যেটা পাণ্ডাপাড়া রোড কালভার্ট থেকে ৮.৪০ কিমি (আনুমানিক) দূরে পাঙ্গায় পড়েছে ওটাই একমাত্র নিষ্কাশনের উপায়, তাই পরিকল্পটি (Scheme) কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

* Phase I > Re-excavation of Gadadhar River upto confluence point of Gadadhar & Panga (.....)
* Phase II > Re-construction of peripheral drains and lateral drains alongwith modification of existing structure

সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করে দেখা যায় যে জলপাইগুড়ি শহরের যা নির্গত (discharge) তা গদাধর নদীকে প্রয়োজনীয় মাপে নিয়ে এলেই ওই নদী এ শহরের নির্গত বহন করতে সক্ষম। তাই এর পুনঃখননের (re-section)-এর উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়। মুশকিল হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের সীমান্তবর্তী নালাসমূহ peripheral drains) ঠিকমতো গদাধরের সঙ্গে সংযোজিত নয়, যেটুকু আছে সেগুলোও প্রয়োজনীয় মাপে (Design Section) নেই এবং অধিকাংশই পলি পড়ে ভরাট হয়ে আছে। তাই স্কিমটিতে সীমান্তবর্তী নালাসমূহ সমস্ত নকশামত নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া পার্শ্বীয় নালাসমূহের (lateral drains) অবস্থা আরও খারাপ। অধিকাংশই সীমান্তবর্তী নালাসমূহের সঙ্গে সংযোজিত নয়। এ ছাড়া রয়েছে কয়েকটি অননুমোদিত বাড়ির বাধা, পার্শ্বীয় ও সীমান্তবর্তী নালাসমূহের ওপর অসংখ্য জলনিকাশি সুড়ঙ্গ (Culvert), সেগুলোও প্রয়োজনীয় মাপে নেই। এসবগুলোই নকশা মাপে ধরে পরিকল্পটি (Scheme) করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভাকে পার্শ্বীয় নালাসমূহ ও এর ভেতরের নির্মাণগুলির পরিবর্তনের ভার দেওয়া হয়েছে এবং এটা করা গেলে শহরের জল পার্শ্বীয় নালাসমূহের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী নালাসমূহে এসে সেখান থেকে গদাধর নদীতে পড়বে ও গদাধর থেকে তারপর পাঙ্গায় গিয়ে পড়বে। এ কাজ সম্পূর্ণভাবে করা গেলে জলপাইগুড়ি শহরের জলনিষ্কাশনের সমস্যার সমাধান অনেকটাই করা যাবে বলে বিশ্বাস।

এসব সমস্যা যেমন আছে তেমনি আছে করলা নদী উপচে পড়ার সমস্যা। যখন তিস্তার জলতল উঁচু থাকে ও একই সঙ্গে স্থানীয় বৃষ্টিতে করলা নদী ভরাট থাকে তখন তিস্তার জল করলা নদীতে ঢুকে যায়, ফলে করলা উপচে পড়ে। করলা উপচে যাওয়ার দরুন দিনবাজার, হসপিটালপাড়া, নেতাজিপাড়া প্রভৃতি বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। অবশ্য গত কয়েক বছর ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে, যখন স্থানীয় বৃষ্টিতে করলা নদী ভরাট হচ্ছে তখন তিস্তার জলতল বেশ নিচু ছিল।

তিস্তার জল করলা নদী দিয়ে শহরে ঢুকে পড়ার কারণে, প্রায় কুড়ি বছর আগে জুবিলি পার্কের সন্নিকটে, তিস্তা করলাকে দ্বিধাবিভক্ত (bifurcate) করে একটা ৪.৩০ কিমি বাঁধ তৈরি করা হয়—যার নাম দেওয়া হয় Segregating Embankment এবং এতে করে করলা নদীকে তিস্তার আরো ভাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিস্তার জলতল নিচু থাকার দরুন খুব সহজেই করলার জল তিস্তা টেনে নিত। এই প্রক্রিয়াতে কয়েক বছর বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু আস্তে

আস্তে পলিজনিত সমস্যায় করলার বেড আবার উঁচু হতে শুরু করে এবং নাব্যতা কমে যাবার ফলে সমস্যা একই থেকে যায়। তিস্তা ব্যারেজ থেকেও গত কয়েকবছর খালের মাধ্যমে বছরের কয়েকটি সময় জল ছেড়ে করলার নাব্যতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

এই সমস্যার সমাধান স্কিমে দুভাবে ভাবা হয়েছে :

সমাধান নং : ১

প্রথমেই করলার কিছুটা নির্গত (৪৫০ কিউমেকের শতকড়া ৩০ ভাগ) খরখরিয়া দিয়ে পাঙ্গাতে ফেলতে হবে। এর ফলে খরখরিয়া থেকে পাঙ্গা পর্যন্ত নতুন একটা বেষ্টনী নালা (Diversion Channel) কাটতে হবে। খরখরিয়ার পুনঃখনন দরকার হবে এবং করলা ও খরখরিয়া নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে নতুন একটা স্লুইসের প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া বেষ্টনী নালাটি রেলওয়ে কালভার্টের ভেতর দিয়ে যাবার কারণেই কালভার্টের নির্গমনপথ বাড়াতে হবে। এ ছাড়াও কিছু জমি অধিগ্রহণের প্রশ্ন থাকবে এবং যেহেতু গদাধরের সঙ্গে করলার জলও পাঙ্গায় ঢুকবে তাই সঙ্গে সঙ্গে পাঙ্গারও পুনঃখনন দরকার।

সমাধান নং : ২

দু'নম্বর সমাধানে ধরা হয়েছে যে বর্তমান Segregating Embankment-কেআরও প্রায় ৩ কিমি বাড়িয়ে দেওয়া, যেখানে তিস্তার জলতল আরও নিচুতে। আর তিস্তা এখানে নিচুতে থাকার কারণে করলার জল অনায়াসেই টানতে পারবে। তা ছাড়া করলা ও তিস্তার সংযোগস্থলে একটি নতুন স্লুইস বসাতে হবে যাতে তিস্তার জলতল উঁচু থাকলেও করলায় জল ঢুকতে না পারে।

Phase-I এবং Phase II-এর কাজের সাফল্য দেখে বাকি Phaseগুলোর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Phase II-এ পাঙ্গা নদীর Re-sectioning

Phase IV-এ RE-sectioning Solution No. 1 অথবা Solution No. 2 "Techno Economically" viable দেখে স্থির করা হবে।

তবে এটা ঠিক যদি অর্থের জোগান ঠিকমতো থাকে তাহলে স্কিমের কাজ যখন শুরু হয়েছে নিষ্কাশনিজনিত সমস্যার অনেকটাই দূর হবে ধীরে ধীরে।

বন্যাজনিত সমস্যা

১৯৬৮ সালে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয়েছিল অনেক। তার কারণ সময়মতো সতর্কবার্তা পৌঁছে দিতে না পারা। কিন্তু আজ ২০০০ সালের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধন হওয়ায় এখন বিপদসংকেত অনেক আগেই জানা যায়। ১৯৬৮ সালে যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল তারপর থেকে স্বল্প অর্থের মধ্যে প্রতি বছরই উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগ (NBFCC) কিছু কিছু কাজ করে। আজ জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তার বাঁধগুলো অনেক শক্তপোক্ত। বেশির ভাগ বাঁধগুলোই পাথর দিয়ে বাঁধানো। তা ছাড়া স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে রয়েছে বোল্ডার স্পার। বর্ষার অনেক আগে থেকেই হাতে যা অর্থ থাকে তার মধ্য থেকে যতটা সম্ভব আগের বছরের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও স্পারগুলোকে সারিয়ে ফেলা হয়। আর্থিক ব্যাপারে জেলা পরিষদও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করে এবং ইদানীংকালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদও এগিয়ে এসেছে। এসব সত্ত্বেও তিস্তার প্রচণ্ড জলপ্রবাহ বর্ষাকালে মাঝে মাঝে যখন কোনো স্পারকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করতে থাকে তখন উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ আয়োগের ইঞ্জিনিয়ার, কর্মী ও কাছাকাছি থাকা স্থানীয় মানুষদের রাতের ঘুম চলে যায়। যে কেউ এখন জলপাইগুড়ি শহরের বাঁধ পরিদর্শন করলে বাঁধের চওড়া, বোল্ডার অ্যাপ্রোন, বোল্ডার পিচিং ও স্পার দেখে ভাববেন জলপাইগুড়ি শহর বন্যার কবল থেকে মুক্ত।

কিন্তু সত্যিই কি তাই ? তা কিন্তু নয়। ১৯৬৮ সালে ৭ লাখ কিউসেক নির্গত তিস্তা দিয়ে বহে গিয়েছিল। ৭ লাখ কিউসেক সর্বাধিক নির্গত (maximum discharge) এবং তার সঙ্গে free board-ধরে আমাদের বাঁধগুলোর নকশা করা হয়। সবকিছুই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু প্রতি বছর পলি পড়ে পড়ে তিস্তার বেড উঁচু হয়ে যাচ্ছে, আনুমানিক গড়ে ৬" থেকে ৮" পলি প্রতি বছর জমা হয়। ফলে দু পাড়ে বাঁধ থাকার দরুন তিস্তা নদীর জলধারণের ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। গত কয়েক বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে স্বাভাবিক বন্যায় দেড় থেকে দু লাখ কিউসেক জল বয়ে যায় তিস্তা নদী দিয়ে। প্রচণ্ড বন্যা হলে সাড়ে তিন লাখ বা চার লাখ কিউসেকের বেশি জল কখনো যায়নি গত কয়েক বছরে। তিন লাখের ওপরে গেলেই বাঁধের এবং স্পারের বহু জায়গাতেই ভাঙন দেখা দেয়। কী হবে যদি সাত লাখ কেন, পাঁচ লাখেরও ওপর দিয়ে নির্গত জল যায় ? এবং গেলে কোনো বাঁধই টিকবে না। তিস্তার এখন অত জলধারণের ক্ষমতা নেই। ফলে একবার যদি কোনো রকমে জল বাঁধ ভেঙে উপচে যায় তখন বাঁধকে আর রক্ষা করা সম্ভব হবে না— সেই ভয়াবহতা ভাবা যায় না।

সমাধান :

এর সমাধান একটাই বাঁধকে আরো উঁচু করতে হবে। গড়ে যে পলি পড়ছে সেটা ধরে স্বাভাবিকভাবেই যতটা সম্ভব বাঁধের উচ্চতা ততটাই বাড়াতে হবে। প্রশ্ন টাকার এবং জমির। এ ব্যাপারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রশাসনিক বিভাগীয় ভূমিকাও এক্ষেত্রে অনেকটা। কারণ বাঁধ উঁচু করলে বাঁধের ঢাল অনেকটাই খেতখামারের দিকে এসে পড়বে এবং সেখানে যেসব বেআইনি বাড়ি আছে সেগুলোকে তুলে দিতে হবে। কিন্তু এ সমস্যার সমাধান কখনো এক বছরে করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতি বছর যদি কিছু কিছু অঞ্চলে কাজ করা যায় তাহলে পাঁচ-ছ বছরে না হলেও দশ বছরে দেখা যাবে এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। সেচ বিভাগের পক্ষে একা টাকার জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। জেলা পরিষদ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পরিষদকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে এবং কাজটা পর্যায়ক্রমে করতে হবে। এক একটা অঞ্চলে প্রথমে মাটির কাজ করে নিতে হবে। যেহেতু টাকার সমস্যা আছে মাটির কাজে হয়তো অতটা অর্থের প্রয়োজন হবে না। আস্তে আস্তে ঢালে বোল্ডার পিচিং বা নিদেনপক্ষে turfing করতে হবে। বড় কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটু একটু করে করলে একদিন তা শেষ হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অববাহিকায় ক্রমবর্ধমান বনাঞ্চল হ্রাস এবং বৃহৎ আকারে মৃত্তিকা খনিজ অঞ্চলে খনন রোধ করতে হবে। হয়তো এর সমাধানের আরও রাস্তা বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন। কিন্তু নজরটা এখনই দেওয়া দরকার, কেননা দেখা দরকার ১৯৬৮ সালের মতো ভয়াবহ বন্যার কবলে জলপাইগুড়িবাসীদের যেন আর পড়তে না হয়।

প্রদীপলাল ব্যানার্জি □ নির্বাহী বাস্তুকার/সেচ ও জলপথ দপ্তর

হীরক জয়ন্তী বর্ষের প্রাক্কালে— নদী বিজ্ঞান মন্দির

মানিক দে

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। বন্যা, নদী ভাঙন বাংলার নিত্য সাথী। মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। তাই বন্যার ভয়াবহ প্রকোপ ও নদীর অন্যান্য সমস্যার সমাধানে নদীর চরিত্র, গতি প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণার প্রয়োজন। দীর্ঘ ষাট বছর আগে বিভিন্ন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক ও বাস্তুকার এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। বিশিষ্ট বাস্তুকার স্বর্গীয় এস সি মজুমদার দীর্ঘদিন ধরে বাংলার সেচ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বাংলার বদ্বীপ অঞ্চলের নদ নদীর বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করেন। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা বন্যা ও নদীর অন্যান্য সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় তিনি "বঙ্গদেশে জলবিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রয়োজনীয়তা" (Need for Hydraulic Research Laboratory in Bengal) সম্বন্ধে এক নিবন্ধ লেখেন, ওই নিবন্ধে নদীর বিভিন্ন সমস্যা, গতি প্রকৃতি, বন্যা সেচ, পরিবহন, জলবিদ্যুত নিয়ে গবেষণার জন্য এক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার ওপর জোর দেন। তিনি জল বিজ্ঞান সংক্রান্ত মূল পরিসংখ্যান, তথ্য নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ওপর জোর দেন। নিয়মিত নদীর হাইড্রোলজিক সারভে, জলের গতিবেগ, বৃষ্টির পরিমাপ, নদীবাহিত নিলম্বিত পদার্থের পরিমাণ, নদীর জলতলের উচ্চতা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য একটি দপ্তরের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করেন। এরকম একটি গবেষণাগারের সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি কলেজ (Engineering College) গুলোর সমন্বয় থাকার কথাও তিনি বলেন।

বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্যার ফ্রানসিস্ (Sir Francis) কর্তৃক রচিত "রিভার ট্রেনিং ও কন্ট্রোল অন গাইড ব্যাঙ্ক সিস্টেম" (River Training & Control on Guide Bank System) থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেন। স্যার ফ্রানসিস্ স্প্রিং নদীর চরিত্র গতি প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান অর্জনের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি নদী বিজ্ঞানের বিভিন্ন সমস্যা, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও নিয়মিত গবেষণার জন্য রিভার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন। স্বর্গীয় বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা তাঁর সুপারিশের সমর্থনে জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের হাইড্রোলিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

"বাঙলার খরা নদীকে বাঁচিয়ে দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই সর্বাগ্রে তাদের বিষয়ে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুশীলন।" এই গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন আমাদের দেশের দুই বরেণ্য সন্তান বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা ও স্বনামখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সতীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়। মুখ্যত এঁদেরই আন্তরিক প্রচেষ্টাতে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের এক শুভ মুহূর্তে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের (River Research Institute) যাত্রা শুরু হয়। নদী বিষয়ে গবেষণাকল্পে বাংলা সরকার প্রথমে পাঁচ বৎসরকালের জন্য নদী বিজ্ঞান মন্দিরের স্থাপনা করেন। জন্মলগ্নে এই সংস্থার অনুকৃতি বিষয়ে (Model) গবেষণার কাজ শুরু হয় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাইড্রোলিক ল্যাবরেটরিতে। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান শাখার কাজকর্ম শুরু হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরিতে। রাশি বিজ্ঞান শাখার কাজ শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের পরিসংখ্যান বিভাগে। ওই বছরের (১৯৪৩) শেষার্ধে বর্ধমানের অনতিদূরে গলসীগ্রামে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের নিজস্ব হাইড্রোলিক ল্যাবরেটরির একটি শাখা গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় একটি শাখা খোলা হয় কলকাতার উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ায়। নদী বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তার অফিস শুরু হয় আলিপুরে অ্যান্ডার্সন হাউসে (বর্তমানে ভবানী ভবন)।

১৯৪৫ সালের মধ্যেই সংস্থার কাজকর্মের পরিধি এত বেড়ে যায় যে পরিসংখ্যান বিভাগটি অধিকর্তার মূল অফিস আলিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়, "পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান" শাখাকে কলকাতার দক্ষিণ দিকে টালিগঞ্জের রসা নামক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ওই স্থানে মৃত্তিকার চরিত্র পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকাবিজ্ঞান শাখা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়।

নদী বিজ্ঞান মন্দিরের পাঁচ বৎসর পূর্তির পূর্বেই হয়ে যায় ভারত ভাগ এবং বাংলার দ্বিখণ্ডীকরণ। ভাগ্যক্রমে সমগ্র সংস্থাটি রয়ে যায় অধুনা পশ্চিমবাংলায়। ক্রমশ নদী বিজ্ঞান মন্দিরের কাজের পরিধি এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার একে স্থায়ী ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা হল। সংস্থাটির কাজকর্ম পরবর্তী দশ বছর এভাবে বিভিন্ন জায়গায় চলতে থাকে।

কাজকর্মের সুবিধা ও পারস্পরিক বিভাগের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে গবেষণার উন্নতির জন্য ১৯৫৩ সালে কলকাতা থেকে ৩৫ মাইল দূরে হরিণঘাটায় প্রায় ৩০০ একর জমির ওপর এক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। রসার পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও মৃত্তিকা বিজ্ঞান শাখা তিনটি এখানে স্থানান্তরিত করা হয়। বেলঘরিয়ায় অবস্থিত অনুকৃতি শাখাকেও (মডেল স্টেশন) এখানে স্থানান্তরিত করা হয়, পরীক্ষাগারের কাজকর্ম ও অনুকৃতি-বিষয়ক গবেষণার কাজ সুস্থভাবে করার

কংসাবতী জলাধারের সেডিমেন্টশন সার্ভে

জন্য আধিকারিক ও কর্মচারীদের জন্য সরকারি আবাসনও তৈরি করা হয়।

পরিসংখ্যান বিভাগ ও অধিকর্তার অফিস বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রয়োজনে কলকাতায় রেখে দেওয়া হয় ও পরে খাদ্য ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

নদী বিজ্ঞান মন্দিরের জন্মলগ্নে সেচ বিভাগের জরুরি সমস্যাগুলির সমাধানই ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই সমস্যাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও নদী বিজ্ঞান বিষয়ক নানা মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এর কর্মধারা ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে, নদীর গতি প্রকৃতি সম্যকভাবে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা করা খুবই জরুরি, ভবিষ্যতে বিভিন্ন বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও বিদ্যুত উৎপাদন প্রকল্পের বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ব্যাপী নদীর বিভিন্ন তথ্য যেমন জলতলের উচ্চতা (Stage), জলের গতিবেগ, জলপ্রবাহের পরিমাণ (Discharge), নদীবাহিত পলির পরিমাণ, বিভিন্ন সময়কার প্রবাহমাত্রা, অববাহিকায় বারিপাত সংগ্রহ করা খুবই জরুরি। নদী বিজ্ঞান মন্দিরের জন্মলগ্ন থেকেই পরিকল্পনামাফিক বাংলার প্রধান প্রধান নদীগুলির বিভিন্ন স্থানে নদীর উপরোক্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা শুরু হয়। পরিসংখ্যান বিভাগ এইসব সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য মৌলিক গবেষণাও করে চলেছে। তাছাড়া অনুকৃতি ও অন্যান্য বিভাগের পর্যবেক্ষণলব্ধ ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব এই বিভাগের উপরে ন্যস্ত। আমাদের দেশে নদী বিষয়ে দীর্ঘকালের তথ্যাদি বেশি সংগৃহীত না থাকায় অধিকাংশ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয়। ভবিষ্যতে যাতে এ অভাব না দেখা দেয় তার জন্য এখান থেকে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন নদী বিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহাকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন নদীর সর্বোচ্চ বন্যার পরিমাণ নিরূপণে, বন্যাসমূহের পরিসংখ্যান (Frequency Analysis) নির্ধারণের নিয়ম এবং সম্ভাব্য প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে। নদীর চরিত্র বিশ্লেষণে সংখ্যাতত্ত্ব ও গাণিতিক বিভিন্ন নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে। দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদী পরিকল্পনায় নির্মীয়মাণ জলাধারগুলির আয়ুষ্কাল বিষয়েও এই শাখায় কাজ হয়েছে।

ময়ূরাক্ষী জলাধার, কংসাবতী ও কুমারী জলাধারের আয়তন পলি পড়ার ফলে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। পলির পরিমাণ ও জলাধারগুলির ক্রমহ্রাসমান আয়তন পরিমাপের জন্য নিয়মিত সময় অন্তর জলাধারের পলি সঞ্চয় সমীক্ষা (Reservoir Sedimenation Survey) করা হয়।

অসংখ্য নদ নদী ও খাঁড়ি সম্মিলিত সুন্দরবনের দক্ষিণ দিক ঘেরা বঙ্গোপসাগরে অনবরত জোয়ার ভাঁটার দরুন সমুদ্রের তীব্র নোনাজল নদী ও খাঁড়ি পথে চারপাশ দিয়ে জমিতে ঢুকছে। জমিগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বাঁধের যাতে নদীর জোয়ারের নোনাজল আবাদে না ঢোকে বা ঝড়-ঝঞ্ঝায় যাতে উন্মত্ত নোনা জলরাশি জমিতে ঢুকতে না পারে। নদী ও সমুদ্র পাড়ে বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি প্রায় কিছুই হত না। এছাড়া বাঁধগুলি উপযুক্ত মানেরও ছিল না। ফলত জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে ওইসব নদী বাঁধ প্রায়ই ভেঙে যেত। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ হয় এবং ১৯৫৫ সালে প্রায় ২০০০ মাইল নদী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ওপর

ন্যস্ত হয়। জমিগুলির উন্নতি সাধনে ও বাঁধগুলির উন্নতির জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা (Master Plan) তৈরি করা হয়। নেদারল্যান্ডের গবেষকদের সাহায্যে নদী বিজ্ঞান মন্দিরে সপ্তমুখী নদী ও এর সংযোগকারী খাঁড়িগুলির পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব নদী ও খাঁড়িগুলির চরিত্র নির্ণয়ের জন্য জোয়ার ভাঁটার গাণিতিক হিসেব নিকেষও করা হয় এবং এক পরিপূর্ণ তথ্য সম্মিলিত রিপোর্ট (Sundarbans Delta Project, Phase-1) তৈরি করা হয়।

যে কোনও নদীর উন্নতিকল্পে ও নদীর জলের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কোনও পরিকল্পনা কার্যকরী হবে কিনা তা জানবার জন্যে গভীর বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষার প্রয়োজন হয়ে থাকে, নদীর প্রবাহ এমন কতকগুলি জটিল প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যে সব সময়ে সব ক্ষেত্রে গাণিতিক উপায়ে বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। তাই নদীর নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অনুকৃতির (Model) সাহায্যে পরীক্ষা খুবই উপযোগী। এখানে মূল নদীর ছোট্ট একটি অনুকৃতি তৈরি করে তাতে নানা ব্যবস্থা আরোপ করা হয় এবং বিভিন্ন অবস্থাদি বিশেষভাবে লক্ষ করে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে যাতে কোটি কোটি টাকার অপচয় না ঘটে তা প্রত্যক্ষ করার অমোঘ উপায় এই অনুকৃতির সাহায্যে পরীক্ষা।

অনুকৃতি শাখার প্রথম কাজ শুরু হয় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাইড্রোলিক ল্যাবরেটরিতে। রনডিয়াতে (Rondia) দামোদরের উপর অ্যান্ডারসন কপাট বাঁধ (Anderson Weir) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও প্রতিকারের উদ্দেশ্য নিয়ে অনুকৃতির কাজ শুরু হয়। পরে এই কাজটি আরও বড় আকারে গলসীতে শুরু হয়। এই দুই জায়গার গবেষণার ফল মিলিয়ে পরিপূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং সেই অনুসারে কপাট বাঁধটি সারানো হয়। নদী বিজ্ঞান মন্দিরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নদীর অনুকৃতির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। তাদের কয়েকটির নাম নিচে দেওয়া হল—

(১) দামোদর উপত্যকা প্রকল্প
(২) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাবলী
(৩) কংসাবতীর ধারক অনুকৃতি
(৪) ব্রহ্মপুত্র নদের অনুকৃতি
(৫) ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প
(৬) সুবর্ণরেখা ব্যারেজ প্রকল্প
(৭) কুলটিগাং-এর অনুকৃতি
(৮) তিস্তা নদীর অনুকৃতি

পলি থেকে নদীর যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে পরীক্ষা পদার্থবিদ্যা শাখায় করা হয়। নদীর বিভিন্ন প্রবাহবস্থায় কি পরিমাণ পলি বর্তমান, তাতে ছোট বড় বিভিন্ন রকমের দানার সমাবেশ কি রকম, এখানে তা জানার উদ্দেশ্যে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই বিভাগ সংলগ্ন একটি কারখানা আছে, যন্ত্রাদি

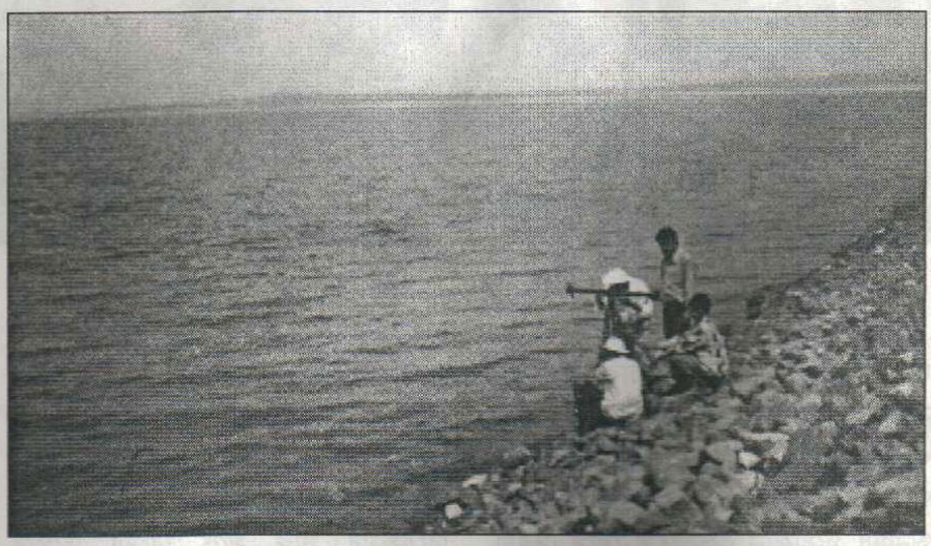

রেঞ্জ ফাইন্ডারের সাহায্যে সার্ভের কাজ চলছে

মেরামত ও নির্মাণের ক্ষেত্রে তারই সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

রসায়ন শাখায় বিভিন্ন নদনদী থেকে সংগৃহীত জলের গুণগত চরিত্র পরীক্ষা করা হয়। এ ছাড়া পলি পড়ার ওপর নর্দমার আবর্জনার প্রভাব সম্পর্কেও এখানে গবেষণা করা হয়েছে। এখানে গবেষণা করে বালু ও অভ্র পৃথকীকরণের সহজ উপায় আবিষ্কার করা হয়েছে।

মৃত্তিকা বিজ্ঞান শাখায় মৃত্তিকার বিভিন্ন গুণগত দিক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ এক পরিপূর্ণ পরীক্ষাগার আছে। এখানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও অনেক বেসরকারি সংস্থা থেকে সংগৃহীত মৃত্তিকার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

কংক্রিট পরীক্ষাগারে কংক্রিট মিশ্রণের চরিত্র পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে।

হরিণঘাটায় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের গ্রন্থাগারে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান পুস্তিকা সমৃদ্ধ এক গ্রন্থাগার আছে।

নদী বিজ্ঞান মন্দির তার বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে ষাট বছরে পদার্পণ করেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে সেমিনার ও ট্রেনিং পরিচালনা করেছে। এখানকার গবেষকগণ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে ও করছে। এই সংস্থা ধারাবাহিকভাবে নিজস্ব একটি বার্ষিক জার্নাল "River Behaviour and Control" প্রকাশ করে চলেছে। জলবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রেও সফলভাবে বিভিন্ন কারিগরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে কাজ করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নদী বিজ্ঞান মন্দিরের আধুনিকীকরণও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। গবেষণা, সারভে ও দৈনন্দিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরও দক্ষতার সঙ্গে ত্রুটিহীনভাবে করার জন্য দরকার বিভিন্ন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। এই লক্ষ্যে নদী বিজ্ঞান মন্দিরের আধুনিকীকরণের জন্য ১৯৯০ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এক কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি তাদের সুচিন্তিত মতামতসহ এক পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে জমা দিয়েছে। হীরক জয়ন্তী বছরের প্রাক্কালে আমাদের আশা আধুনিকীকরণ কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী হলে নদী বিজ্ঞান মন্দির পুনরায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

মানিক দে □ উপ-অধিকর্তা নদী বিজ্ঞান মন্দির/সেচ ও জলপথ দপ্তর

জলসম্পদ সংরক্ষণে সচেতনতা

দিলীপ কর্মকার

জল, প্রাকৃতিক উৎসের প্রধান সম্ভার। মানবজাতির তথা প্রাণীকুলের অত্যন্ত লিক চাহিদা পূরন করে জল। জল ছাড়া ন বাঁচে না, তাই জল বহু মূল্যবান ীয় সম্পদ। পরিবেশের ভারসাম্য ও তার অগ্রগতির লক্ষ্যে জল বৃহৎ ভূমিকা ন করে থাকে। জলের প্রয়োজনীয়তা রিসীম।

পৃথিবীর যত দেশে বড় বড় নগর তা গড়ে উঠেছে তা কোনও না কোনও নদী বা সমুদ্রে তীরে। প্রাচীন যত তা লুপ্ত হয়েছে তাও গড়ে উঠেছিল ও না কোনও নদ-নদীর তীরে। সিন্ধু তা এর একটি প্রমাণ। আমাদের দেশের মহানগরী যেমন গড়ে উঠেছে হুগলি, নদী, যমুনা নদী ও সমুদ্রের তীরে, তেমনই দেখা যায় বিদেশের বেশিরভাগ উন্নত ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরও গড়ে উঠছে কোনও না কোনও নদ-নদীর তীরে। রুশ দেশের মস্কো শহর অবস্থিত মস্কোভা নদীর তীরে। জার্মানির সুন্দর বার্লিন শহর অবস্থিত স্প্রি নদীর তীরে। গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন শহর অবস্থিত টেম্‌স নদীর তীরে। মিশরের রাজধানী কায়রো শহর গড়ে উঠেছে ঐতিহ্যপূর্ণ নীলনদের তীরে। ইরাকের বাগদাদ শহর অবস্থিত টাইগ্রিস নদীর তীরে। প্রকৃতির এই দান যুগ যুগ ধরে মানব কল্যাণে ও সভ্যতার অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। জল আমাদের সম্পদ। জল আমাদের প্রতিপালন করে, জীবন বাঁচায়; তাই জলের বিভিন্ন উৎসকে সঠিক ভাবে প্রতিপালন করাও উচিত আমাদের। জলসম্পদকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে 'জলসম্পদ দিবস' (Water Resource Day) আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। জন সচেতনার লক্ষ্যে এই দিবস। ১৯৯৪ সালে ইউনাইটেড নেশন্‌স অরগানাইজেশন (United Nations Organization) মার্চ-এর ২২ তারিখটি 'পৃথিবী জল দিবস' (World Day for water) উদ্‌যাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে। ২০০৩ সালে জলদিবস উপলক্ষে এই বিষয়টি নির্বাচিত হয়েছে আমাদের দেশে। কৃষিক্ষেত্রে এবং শিল্পে জলের সংরক্ষণ (Conservation of

ুরা জোড় সেচ প্রকল্প

water in Agriculture and Industrial sectors)।

এবার ভারতবর্ষের নিরিখে জলসম্পদের অবস্থানটি একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ৩২৯ মিলিয়ন হেক্টর। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে গড়ে ১১৭০ মি. মি.। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মোটের ওপর ৪০০০ বিলিয়ন কিউবিক মিটার (বি সি এম)। জাতীয় স্তরে মূল্যায়ন করা হয়েছে যে, বার্ষিক ১৫৫৩ বি সি এম জল প্রবাহিত হয়ে থাকে নদী অববাহিকাতে। উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকাসমূহ বেশিরভাগ জলসম্পদের জোগান দেওয়ার জলের বহুমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে। শস্য উৎপাদনে, শিল্পে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, গৃহস্থালীর ব্যবহারে, জলযানের পথ উন্নয়ণে এবং সর্বেপরি জীব-বৈচিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে। ভারতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে বছরে ৩-৪ মাস। ফলে এখানকার চাষবাস প্রধানত সেচের জলের উপর নির্ভরশীল। প্রাপ্য জল সম্পদের ৮৩ শতাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেচের কাজে। ৪.৫ শতাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে শহর ও গ্রামে গৃহস্থালীর কাজে ও পানীয় জল সরবরাহে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৩.৫ শতাংশ। শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৩.০ শতাংশ এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ৬.০ শতাংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং চাহিদা ক্রমে এই বিভাজন থাকা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষ সহ সারা পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে। ভারতের জনগণনা ২০০১ থেকে দেখা যায় জনসংখ্যা ১০২.৭ কোটি। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬.৮৭ শতাংশ। পূর্বে ১৯৯১ সালে জনগণনাতে এই সংখ্যা ছিল ৮৪.৪ কোটি। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯০১ সালে ভারতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ছিল ৭৭জন। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা সেই সংখ্যা বেড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা হয় ১৭৭ জন। শেষ জনগণনা ২০০১ সালের হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে হয়েছে ৩২৪ জন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তীতে ১৯৫১ সাল থেকে ২০০১ সাল অবধি অর্থাৎ ৫০ বছরে প্রতিবর্গ কিলোমিটারের জনসংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এই অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যতে হতে থাকলে, চাই অধিক খাদ্য, চাই অধিক পানীয় ও ব্যবহারের জল, চাই অধিক বিদ্যুৎ। এই সকল উৎপাদনে চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে জল। সুতরাং বিপুল জলের চাহিদা বৃদ্ধির পুরণের লক্ষে, আগামী দিনে শুধু ভারতেই নয়, বিভিন্ন দেশে জলের অভাব দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। আগামী দিনে বিভিন্ন প্রকার জলের চাহিদার একটি সারণি দেওয়া হল—

Table-1

REQUIREMENT OF WATHER FOR DIFFERENT USES [BCM]

Sl. No.	Use	Year									
		1997-98	2010			2025			2050		
			Low	High	%	Low	High	%	Low	High	%
1	Irrigation	524	543	557	78	561	611	72	628	807	68
2	Domestic	30	42	43	6	55	62	7	90	111	9
3	Industries	30	37	37	5	67	67	8	81	81	7
4	Power	9	18	19	3	31	33	4	63	70	6
5	Inland Navigation	0	7	7	1	10	10	1	15	15	1
6	Flood Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Environment Afforestation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Environment Ecology	0	5	5	1	10	10	1	20	20	2
9	Evaporation Losses	36	42	42	6	50	50	6	76	76	7
	Total	**629**	**694**	**710**	**100**	**784**	**843**	**100**	**973**	**1180**	**100**

***Source** : Report of the National Commission for integrated water Resorcees Development (Vol-1 Sept. 1999)*

অংশগ্রহণকারী। অন্যদিকে মোটের ৬০ শতাংশ Runoff যা বহু ছোট ছোট নদীসমূহ বহন করে থাকে। এবং সেই সকল নদীসমূহ গ্রীষ্মে শুষ্ক থাকে। আবার এও ঠিক যে বেশীর ভাগ জলের অপচয় হয় নদী-নালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরের সাথে মিশে গিয়ে। তাই সঠিক সময়ে এই জল সঠিক ভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে শুষ্ক সময়ে ওই জল ব্যবহার করা যেতে পারে। এভাবে সংরক্ষণ করলে ভূপৃষ্ঠের জলের ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং ভূগর্ভস্থ জলের চাহিদা ক্রমশ কম হবে। ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাবার সম্ভাবনা কমে যাবে।

পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায় ১৯৫০ সালে আমাদের ভারতবর্ষে বার্ষিক প্রতিজন পিছু জলের প্রাপ্যতা ছিল 5.20 Th. cu.m.। ১৯৯১ সালে প্রতি জন পিছু জলের প্রাপ্যতা কমে যায় এবং প্রাপ্যতা হয় 2.20 Th. cu.m.। ২০০০ সালে এই প্রতি জনপিছু জলের প্রাপ্যতা আরও কমে যায়। এবং প্রাপ্যতা হয় 1.80 Th. cu.m.। বিপুল জনসংখ্যার বৃদ্ধিই এর কারণ। এই হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে অনুমান করা হচ্ছে আগামী ২০২৫ সালে প্রতি জন পিছু জলের প্রাপ্যতা হবে 1.34 Th. cu.m.। আন্তর্জাতিক মান্যতাতে (International standerds) বলা হয়েছে বছরে প্রতি

জন পিছু জলের প্রাপ্যতা 1.00 Th. cu.m.-এর কম হলেই, জলের সঙ্কট দেখা দেবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে জল সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

তাই এই জল সঙ্কট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতে চাহিদা ক্রমে জলের যোগানের লক্ষ্যে, এখন থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। বৃদ্ধি করা প্রয়োজন জল ধারণ করার স্থান। সাথে সাথে এর সংরক্ষণের লক্ষ্যে যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও প্রয়োজন। চাপ দেওয়া প্রয়োজন জনগণের ব্যবহৃত জলের সঠিকতার প্রশ্নে এবং অপচয় বন্ধের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিতে। মোট যে পরিমাণে জলের ব্যবহার হয়, তার প্রায় ৮০ শতাংশর বেশী জল ব্যবহার হয়ে থাকে কৃষিতে। চাষবাসে জলের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচের জল কৃষির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই সঠিক ও প্রয়োজন ভিত্তিক ওই কাজে জলের সরবরাহ করা উচিত। সেচের জল আর বেশী পরিমাণে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেচের জল বিভিন্ন সেচ খালের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়ে থাকে কৃষিক্ষেত্রে। এই সরবরাহের সময় বিভিন্ন ভাবে জলের অপচয় হয়ে থাকে। সেই অপচয়ের প্রতিকার করা প্রয়োজন। বিশেষ ভাবে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন পুকুর, খাল বিল ডোবা সঠিক ভাবে সংসংস্কারের মধ্য দিয়ে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবার। সেচের জল মাঠ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে সকল পরিকাঠামো আছে তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনে সংস্কার এবং সুষ্ঠ ও সঠিক ভাবে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। চাহিদা ক্রমে কৃষি কাজে সঠিক পরিমাণে জলের যোগানের ওপর গুরুত্ব দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে চাষীদের যুক্ত করে সেচের খালের জল ব্যবহারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেতন করারও বিশেষ প্রয়োজন। অর্থাৎ জল সংরক্ষণে ও অপচয় রোধে চাষীদের সক্রিয় ভূমিকাতে অবতীর্ণ করানো। কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা, এ বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

একই প্রক্রিয়ায় জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সঠিক শিল্পের ক্ষেত্রে। যে পরিমাণে জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দিনে দিনে শিল্পের প্রসার ঘটছে। নুতন নুতন শিল্প স্থাপন হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে এই ক্ষেত্রেও জলের চাহিদা বেড়েছে। সুতরাং একই জল শিল্পে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে জলের চাহিদা কমানো যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনে নুতন প্রযুক্তির ব্যবহার। শিল্পের যন্ত্রাংশর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, জলের অবাঞ্ছিত বর্হিগমনের পথ বন্ধ করা, একই জল বারংবার ব্যবহার করে অধিক জলের চাহিদা কমানো যেতে পারে। যে সমস্ত শিল্প সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকাতে অবস্থিত, সেই সকল শিল্পে প্রয়োজন ভিত্তিক সমুদ্রের জল সরাসরি বা শোধন করে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে মিষ্টি জলের চাহিদা শিল্পে কিছুটা কমবে।

সার্বিক ভাবে জলের সংরক্ষণের জন্য চাই সর্বস্তরের সক্রিয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ শুধু সরকারি তরফ থেকে গ্রহণ করলেও ব্যবহারকারিদের একই ভাবনাতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রয়োজনে জন সচেতনতার লক্ষে, এই বিষয়ের পুস্তিকা বিতরণ, সভা করা, জল সংরক্ষণে ও অপচয় রোধের প্রক্রিয়া প্রচার করা আজ বিশেষ ভাবে দরকার। প্রয়োজনে জন সচেতনার লক্ষে প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করা যেতে পারে। উপর্যেুপোর এই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আজ জল সংরক্ষণ আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য। সমাজের সকল স্তরের মানুষকে যুক্ত করতে হবে এই ভাবনায় এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে জল সংরক্ষণের চেতনায়।

তথ্যসূত্র :—Theme Paper on Conservation of mater in Agriculture and Industrial Sectors, Indian water Resources Society & Census of India 2001.

দিলীপ কর্মকার ❑ অবর-সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ১০২টি দ্বীপের সমন্বয়ে সুন্দরবন। উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাড়োয়া, মীনা খাঁ, হাসনাবাদ এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ, ক্যানিং-১, ক্যানিং-২, নামখানা, সাগর, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, মথুরাপুর-১, মথুরাপুর-২, জয়নগর-১, জয়নগর-২ ও কুলতলি—এই মোট ১৯টি ব্লকের ৭,৯০০ বর্গকিমি জুড়ে এর অবস্থান। এখানেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ। ১০২টি দ্বীপের মাত্র ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি আছে।

সুন্দরবনে সেচ ও জলপথ বিভাগের কাজ

মোট প্রান্তীয় নদীবাঁধ ❑ ৩৫০০ কিলোমিটার

* উত্তর চব্বিশ পরগনা : প্রায় ৭৫০ কিমি
* দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : প্রায় ২৭৫০ কিমি

মোট স্লুইস গেটের সংখ্যা ❑ ৮২৫

* উত্তর চব্বিশ পরগনা : ১৭২
* দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : ৬৫৩

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

কর্ম পরিচালনার সুবিধার্থে সেচ দপ্তরের অফিস স্থানান্তর

নর্থ সেন্ট্রাল ইরিগেশান সার্কেল

সেন্ট্রাল ইরিগেশান সার্কেলের কর্মক্ষেত্র বহুদূর—উত্তরে, উত্তর দিনাজপুর থেকে দক্ষিণে, নদীয়া জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজের সুবিধার্থে বেশ কয়েক বছর আগেই সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেল ১ ও ২ নামকরণ করে দুজন অধীক্ষক বাস্তুকার নিয়োজিত হলেও অফিস আগের মতো বহরমপুরেই অবস্থান করছিল। গত ৪ জুলাই ২০০৩ উক্ত দুই সার্কেলের 'নর্থ সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেল' ও 'সাউথ সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেল' নতুন নামকরণ করে 'নর্থ সার্কেল'-এর অফিস মালদহ স্থানান্তরিত করা হয় এবং 'সাউথ সার্কেল'-এর অফিস বহরমপুরেই রাখা হয়।

এদিনের এ স্থানান্তর অনুষ্ঠানে, 'নর্থ সার্কেল' অফিসের উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অমলেন্দ্রলাল রায়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে সেচ ও জলপথ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় গণেশচন্দ্র মণ্ডল, পঞ্চায়েত সভাপতি ও স্থানীয় বিধয়াকসহ সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব, মুখ্য-বাস্তুকার-২ এবং অধীক্ষক বাস্তুকার প্রমুখ বিশিষ্টজন।

নর্থ সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেলের স্থানান্তর অনুষ্ঠানে সেচমন্ত্রী অমলেন্দ্র লাল রায় সহ সেচরাষ্ট্রমন্ত্রী গণেশচন্দ্র মণ্ডল।

স্থানান্তরের ফলে 'নর্থ সার্কেল'-এর কর্মক্ষেত্র দাঁড়ায় গঙ্গার উত্তরের মালদহ, উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এবং 'সাউথ সার্কেল'-এর আওতায় আসে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলা দুটি।

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের অফিস : পুরুলিয়ায় স্থানান্তর

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অমলেন্দ্র লাল রায় কলকাতায় অবস্থিত সেচ ও জলপথ দপ্তরের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের (অধীক্ষক বাস্তুকার)-এর দপ্তর স্থানান্তরিত করে পুরুলিয়ায় উদ্বোধন করেন। অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রীযুক্তা মিঠু সিং সর্দার। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার/১ বিশ্বতোষ সরকার ও নতুন দপ্তরের ফলক উন্মোচন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অমলেন্দ্রলাল রায় ও দপ্তরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রীমন্ত্রী শ্রীযুক্তা বিলাসীবালা সহিস, এছাড়া সরকার মনোনীত ডিপিসির প্রবীণতম সদস্য নকুল মহাতো এবং পুরুলিয়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল মুখার্জি প্রমুখরা।

মাননীয় সেচমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে, এই দপ্তর স্থানান্তরের পর পুরুলিয়ার মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলির নির্মাণকার্য ত্বরান্বিত করার দাবি পূর্ণ হবে আশা করা যায়। এছাড়া মাঝারি সেচ প্রকল্পসমূহের জলাধারগুলি পর্যটকদের কাছে যাতে আকর্ষণীয় করা যায় সে সম্বন্ধে প্রচেষ্টা নেওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

দুটি সাবডিভিশন (উপভুক্তি) অফিসের নাম পরিবর্তন

গত ৪ জুলাই ২০০৩ সাউথ সেন্ট্রাল ইরিগেশন সার্কেল-এর অধীন গঙ্গা অ্যান্টি ইরোশন ডিভিসান-১-এর অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাগঞ্জে অবস্থিত গঙ্গা অ্যান্টি ইরোশন সাব-ডিভিসান-৪ ও ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত গঙ্গা অ্যান্টি ইরোশন সাব-ডিভিসান-৩-এর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে নামকরণ করা হয় জঙ্গীপুর ইরিগেশন সাব-ডিভিশন/১ ও জঙ্গীপুর ইরিগেশন সাব-ডিভিশন/২। উভয় ক্ষেত্রে সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় গণেশচন্দ্র মণ্ডল, সেচ ও জলপথ বিভাগের সচিব, মুখ্যবাস্তুকার, অধীক্ষক বাস্তুকার, স্থানীয় জনসাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় অমলেন্দ্র লাল রায় মহাশয়।

বন্যানিরোধে বাঁধের কাজ

অধীক্ষক বাস্তুকার, পূর্বমণ্ডল-এর অধীনে নাবার্ডের ঋণ সহায়তায় সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলের ইছামতী, কার্জন ক্রিক, জগদ্দল ইত্যাদি নদীবাঁধগুলির সংরক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য পিচিং-এর কাজের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ৮০০০ মিটার নদী বাঁধের সংরক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এগুলি ছাড়াও বেগুয়াখালিতে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী ৬০০ মিটার বাঁধের কাজ শেষ করা হয়েছে। হাডকোর ঋণ সহায়তায় অছিপুর ও ডায়মণ্ডহারবারের কাছে হুগলি নদীর বাম তীরে মোট ৩৯৫০ মিটার বন্যা নিরোধক নদীবাঁধের সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে। আরও ৪৭৮০ মিটার বাঁধের কাজ এগিয়ে চলেছে, যা ২০০৪-এর বর্ষার আগেই শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ববিচিত্রা

সংকলক : অঞ্জন দাশগুপ্ত
মুখ্য বাস্তুকার
সেচ ও জলপথ দপ্তর

ানিয়ুব, ইউরোপের একটি প্রধান আন্তর্জাতিক জলপথ

দানিয়ুব নদী ইউরোপের একটি প্রধান লপথ। ভলগার পরে একই মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদীটির যাত্রাপথ ব্ল্যাক রেস্ট থেকে ব্ল্যাক-সী। দক্ষিণ জার্মানির ্যাভেরিয়ার ব্ল্যাক ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ ২৯০০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে ষ্ণসাগরে নদীটি নির্গত হচ্ছে। এর ববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ ১,৫৬,৫৭০ র্গ কিমি। ব্রিগাখ এ ব্রেখ দুটি পাহাড়ি নদী ার্মানির রিগনেসবার্গ শহরে মিলিত হবার র সম্মিলিত ধারাটির নাম হয় দানিয়ুব। দীর যাত্রাপথে রয়েছে দশ দশটি দেশ। ার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, লগেরিয়া এবং ইউক্রেন। এক একটি দেশ াড়ি দেবার পরে এই নদীর নামও বদলে গছে। জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় যেমন এর নাম ানাউ, হাঙ্গেরীতে দুনা, যুগোস্লাভিয়ায় নাভ, রুমানিয়ায় দুনারিয়া এবং লগেরিয়ায় দুনে।

বহু ইতিহাস, ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষি ানিয়ুব। রোমানরা শত্রুর বিরুদ্ধে একে াকৃতিক পরিখা হিসেবে ব্যবহৃত করত। হ রণতরী, সমরসম্ভার বহন করতে য়েছে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে। কেল্টিক, ভর, হোলিরোমান সাম্রাজ্য, হ্যাবসবার্গ, টোমান তুর্কি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে। ানিয়ুবের প্রবাহ কিন্তু ঠিকই বয়ে গেছে ার পথ ধরে।

কৃষ্ণসাগরে পড়ার স্থানে নদীর গতিবেগ ভূত পরিমাণে মন্থর হয়ে যাওয়ায় সৃষ্ট য়েছে এক মাঝারি আকারের ব-দ্বীপ। এর ায়তন প্রায় ৩৬০৮ বর্গ কিমি। দানিয়ুব উরোপের এক বিশাল জলসম্পদ। যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত পথে বিভিন্ন জাতির প্রয়োজনের জল জুগিয়েছে। বিদ্যুতের উৎপাদন, শিল্পের প্রসারে আজ যেমন জল সরবরাহ করছে, অন্যদিকে নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৮৫ সালে রাইন-মেইন দানিয়ুব খাল খনন করে কৃষ্ণসাগরের সঙ্গে শ্বেত সাগরকে যুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এই নৌ-পরিবহনকারী জলপথের দৈর্ঘ্য ৩৪০০ কিমি। বাণিজ্যিক দিক দিয়ে এর প্রয়োজন আজ অপরিসীম। তবে প্রভূত শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্য পদার্থের প্রভাবে দানিয়ুবের জলের বিশুদ্ধতার অবনতি ঘটছে। দূষণ সৃষ্টি হয়ে পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করায় পরিবেশবিদগণ বিশেষভাবে চিন্তিত। জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ Strauss এর Blue Danube এর Brown Danube-এ পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

সিরিয়ায় বাঁধ ভেঙে বন্যা

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলে অন্যতম আরব রাষ্ট্র সিরিয়া। এই পূর্ব উপকূলের লেবানন, জর্ডন ও ইজরাইলের সঙ্গে এটি অন্যতম লেভান্ট রাজ্য বলেও পরিচিত। দেশটিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। দক্ষিণের মরু অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত যেখানে কেবল ১০০ মিমি, রাজধানী দামাস্কাস অঞ্চলে ২৫০ মিমি, পাহাড়ি তটবর্তী অঞ্চলের কিয়দংশে ১০০০ মিমি। দেশটিতে মাথাপিছু জলসম্পদের পরিমাণ ৭৩২ ঘন মি, ভারতবর্ষের অর্ধেকেরও কম। ১,৮৫,১৮০ বর্গ কিমি আয়তনবিশিষ্ট দেশটির সেচ এলাকার পরিমাণ কেবলমাত্র ৬.০৯%, ভারতে যেখানে ১৭.৩৪%। দেশের পশ্চিমের তটবর্তী অঞ্চলে ওরালটেশ নদী অববাহিকা অঞ্চল খুবই উর্বর। এখানকার আল-ঘাব অঞ্চলে নদীর উপরে সেচ ও অন্যান্য সুবিধের জন্য নির্মিত হয়েছিল জেজুন ড্যাম। শীতকালে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের কারণে বাড়তি ৫০ লক্ষ ঘনমিটার জল আসায় ড্যামে ফাঁটল ধরে এবং পরে ভেঙে যায়। ৭ কোটি ১০ লক্ষ ঘন মিটার জল ধেয়ে আসে এবং নেমে আসে বিপর্যয়। ৮০০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার বিরাট ক্ষতি হয়। সাধারণ মানুষ উঁচু জমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণধারণের চেষ্টা করে।

মধ্য আফ্রিকায় ভয়াবহ খরা

বছর দুয়েক আগে থেকেই মধ্য আফ্রিকার কয়েকটি রাষ্ট্র আবার ভয়াবহ খরার কবলে। সাহারা মরু অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এই খরাপীড়িত দেশসমূহ সম্মিলিতভাবে সাহেল নামে পরিচিত। পশ্চিমে সেনেগাল থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এদের মধ্যে রয়েছে সেনেগাল, মালি, নাইজার, নাইজিরিয়ার উত্তরাঞ্চল, চাদ ও সুদানের উত্তরাঞ্চল। দু'মাস ধরে একটানা অনাবৃষ্টি এবং প্রচণ্ড দাবদাহে প্রায় জলের উৎস অর্থাৎ নদী-নালা পুকুর জলাশয় সবই শুকিয়ে কাঠ। সূর্যতাপ অনেক জায়গায় ৫০° সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। সমগ্র সাহেল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত গড়ের থেকে ২০%-৫০% কমে যায়। নাইজিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের ছোট শহর মাইদুগুড়িতেই মৃতের সংখ্যা ৬০ ছাড়িয়ে গেছে। অন্তর্বর্তী অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এর সঠিক তথ্য হয়তো জানা যাবে না। অনেক দূরবর্তী অঞ্চলের শিল্পপ্রসারের দূষণের এই ভয়াবহ খরা ঘটেছে কিনা বিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিদগণ তার অনুসন্ধান করছেন।

চীনের উত্তরাঞ্চলে বিরাট বন্যা

সানসি চীনের উত্তরাঞ্চলের একটি প্রদেশ। অন্ত-মংগোলিয়ার পার্শ্ববর্তী এই স্থানটি চীনের শুষ্কাঞ্চল বলে চিহ্নিত। গত জুন মাসে প্রকৃতির খেয়ালে এখানে নেমে আসে একটি বিরাট আকারের বন্যা। রাজধানী শহর সিয়ানের দক্ষিণে ৪৮ ঘণ্টায় একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়। এই নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল প্রায় ১০০০ মিমি। প্রবাহিত বিভিন্ন নদী তাদের দুকূল ছাপিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করে। ভূমিক্ষয়, ধসের কারণে জনজীবনে নেমে আসে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ২৫০-এর উপরে জীবনহানি হয়। বহু লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না। ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়।

ঐতিহাসিক যুগে সেচব্যবস্থা

সভ্য মানুষ সভ্যতার প্রভাতকাল থেকেই কঅষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এর জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সময়মতো সেচ। বৃষ্টির দিকে না তাকিয়ে এবং শুষ্ক অঞ্চলে তাই শুরু হয়েছিল কৃষি সেচ। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই প্রাচীনকালে সেচ ব্যবস্থার অস্তিত্ব অনুসন্ধান করা হয়েছে। চলে যাই সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডীয় অঞ্চলে। অনেকদিন আগের ঘটনা, ১৫০০ বছর আগে। এই অঞ্চলে সু-উন্নত ইনকা সভ্যতা গড়ে ওঠে পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে এবং ষোড়শ শতকে স্পেনীয় আক্রমণে তার পতন ঘটে। এরও অনেক আগে, আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দে টিটিকাকা হ্রদের উত্তরদিকে বিকাশ ঘটে ওয়ারি এবং দক্ষিণদিকে টিওয়ানাকু সভ্যতার। এরা খুবই উন্নত ছিল। খনন কার্য, শিলালিপি এবং অন্যান্য নিদর্শন থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান যে, টিটিকাকা হ্রদের সন্নিহিত শুষ্কাঞ্চলে কাটারি নদীর জল ব্যবহার করে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা করে কৃষির প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। জমিকে অনেক স্থানে প্রয়োজনে উঁচু করা হয়েছিল এবং নদীরও গতি পরিবর্তন করা হয় সেচের প্রয়োজনে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের এরূপ ধারণা।

ইউরোপের কয়েকটি দেশও বন্যার কবলে

প্রবল এবং একনাগাড়ে বৃষ্টিপাতের কারণে ইউরোপের কয়েকটি দেশ বন্যার কবলে। নদীতে প্রবল জলস্ফীতিতে তিরিশের উপরে প্রাণহানি, বহু নিরুদ্দেশ এবং অনেকেই গৃহবন্দী। এর মধ্যে সবচেয়ে বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল রাশিয়ায় কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টিপাতের কারণে বহু কাঠের বাড়ি ভেসে গিয়েছে এবং বন্যার জলের তোড়ে বহু যানবাহন সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে। রাস্তা ও জমি হয়ে পড়ে প্রচণ্ড কর্দমাক্ত। চেক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণে মোরাভিয়া অঞ্চলে নদীতে জলস্ফীতির কারণে প্রবল বন্যায় অনেক জীবনহানি ঘটেছে, আবার অনেক গৃহহীন নিরাপদ স্থানের সন্ধানে। এ ছাড়া বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপটে ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রিয়া, ইটালি ও স্পেনের বিভিন্ন স্থানে বড় ও মাঝারি আকারের বন্যা দেখা দিয়েছে।

লেখা পাঠাবার জন্য আবেদন

সেচপত্র পত্রিকাটি সেচ ও জলপথ দপ্তরের সেচব্যবস্থা, নিকাশিব্যবস্থা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি মুখপত্র। প্রকাশের দিন থেকেই এই পত্রিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন একটি পত্রিকার জন্য, উক্ত বিষয়গুলির উপর সেচ বিভাগ ও দপ্তরের সবার কাছে লেখা আহ্বান করছি ; সঙ্গে উপযুক্ত ছবি। সংক্ষিপ্ত সংবাদের স্বার্থে ক্যাপশন-সহ ছবি শীঘ্র পাঠান।

প্রধান সম্পাদক
সেচপত্র

সবুজায়নের পথে পুরুলিয়া

ছোটনাগপুর অধিত্যকার নিম্ন ভূখণ্ড পশ্চিম রাঢ়ের জেলা পুরুলিয়া। নবগঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাশে অবস্থিত এই জেলার ভূ-প্রকৃতি রস গাঙ্গেয়, সমতল থেকে আলাদা। স্বল্প বৃষ্টিপাত, বিস্তীর্ণ কঠিন মৃত্তিকা, শীতাতপের তীব্রতা—এসবের সঙ্গেই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামরত খানকার জনজীবন প্রধানত কৃষিনির্ভর।

শ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক এই জেলার তরঙ্গায়িত শিলাময় ভূমির উপরিভাগ প্রধানত বালি ও কাঁকরমিশ্রিত ল্যাটারাইট মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। ছিদ্র ল্যাটারাইট মৃত্তিকায় জল দ্রুত শোষিত হয়ে ভূগর্ভে চলে যাওয়ার ফলে উপরিভাগের জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম। একদিকে নিশ্চিত বৃষ্টিপাত ও অন্যদিকে খরার ফলে অপ্রতুল কৃষি-উৎপাদন জেলার অর্থনীতিকে করে তুলেছে দুর্বল।

কৃতির এই নিষ্ঠুরতা লাঘবের নিরিখে রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর পুরুলিয়ায় গড়ে তুলেছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি চ প্রকল্প, যা পুরুলিয়া জেলাকে নিয়ে চলেছে সবুজায়নের পথে।

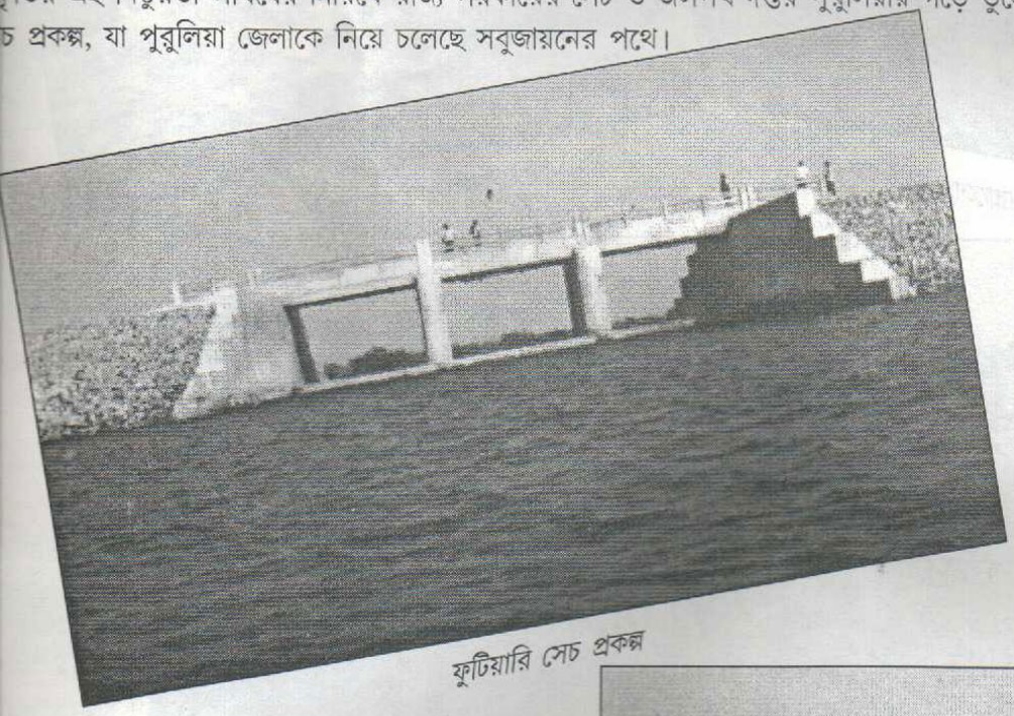

ফুটিয়ারি সেচ প্রকল্প

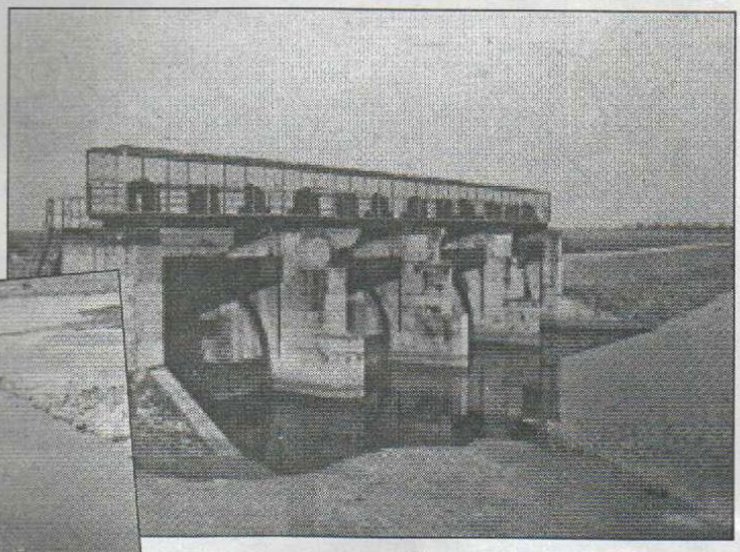

কুমারি সেচ প্রকল্প

রামচন্দ্রপুর সেচ প্রকল্প

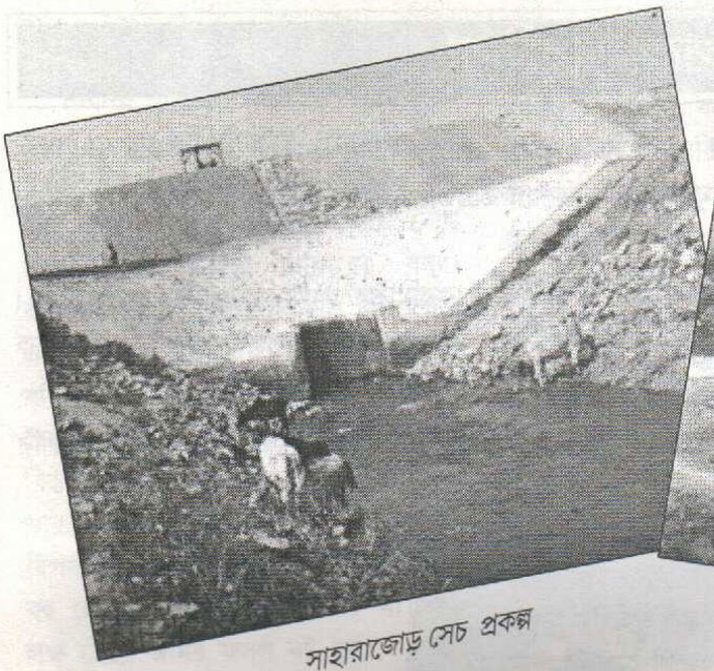

সাহারাজোড় সেচ প্রকল্প

কারিয়র সেচ প্রকল্প

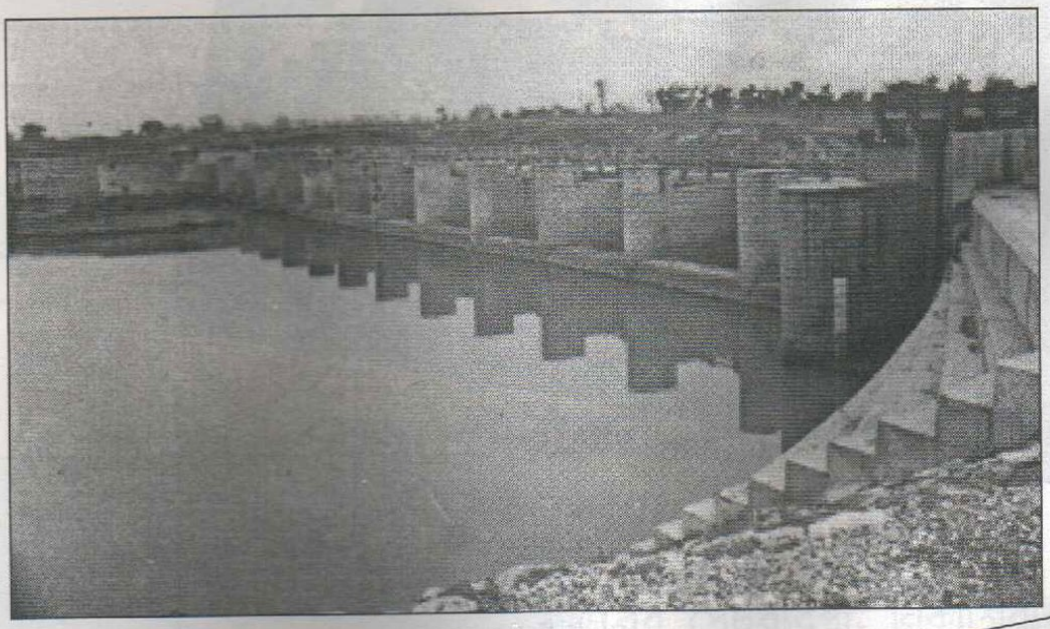

বান্দু সেচ প্রকল্প

বরাভূম সেচ প্রকল্প

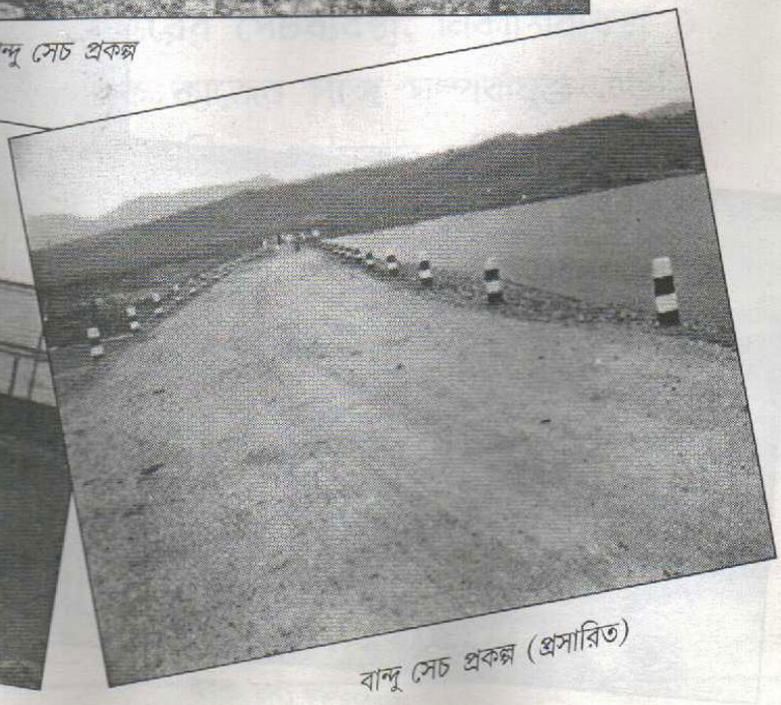

বান্দু সেচ প্রকল্প (প্রসারিত)

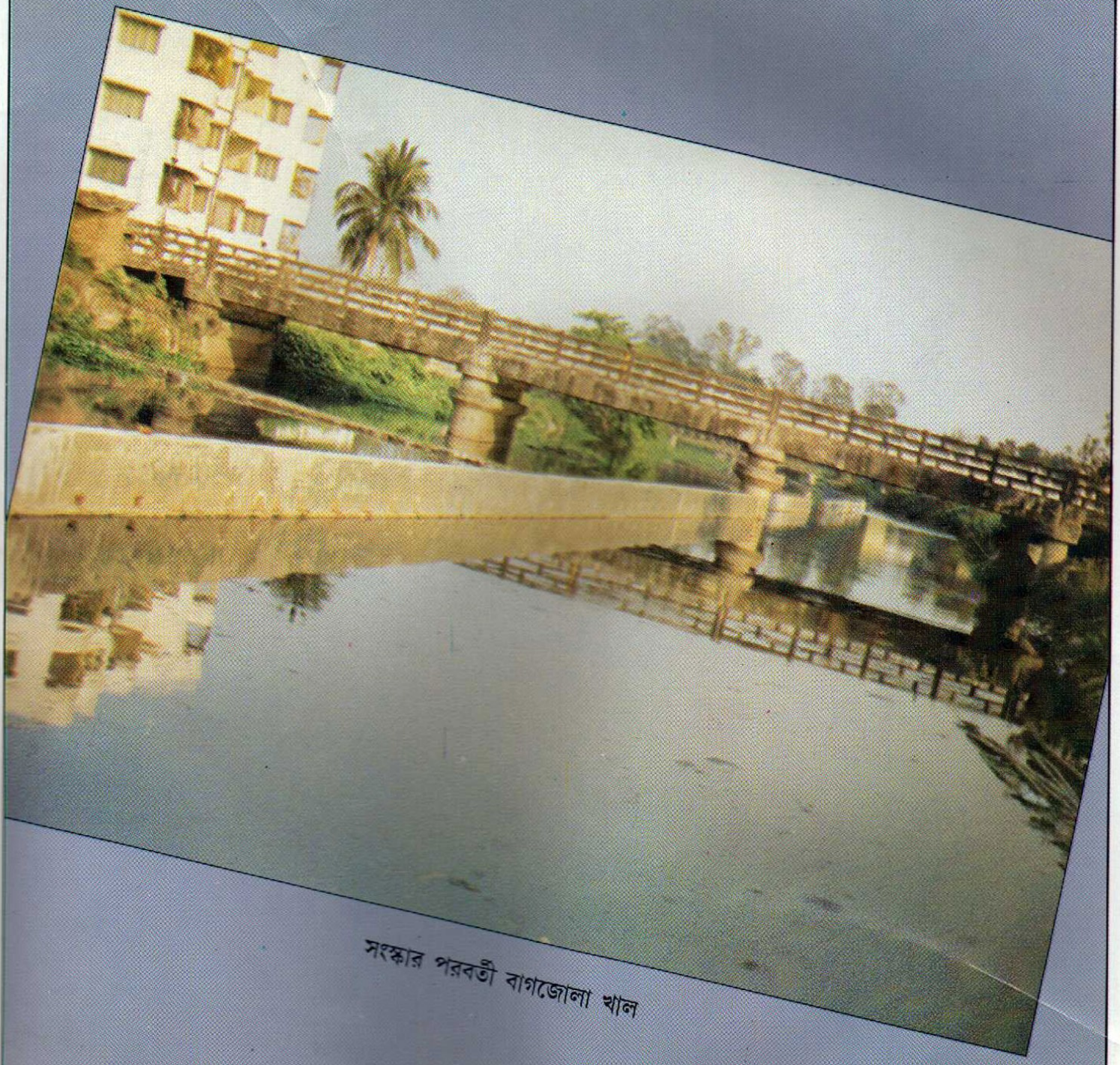

সংস্কার পরবর্তী বাগজোলা খাল

REGD. No. WBBEN / 2000 / 1027

March, 2004

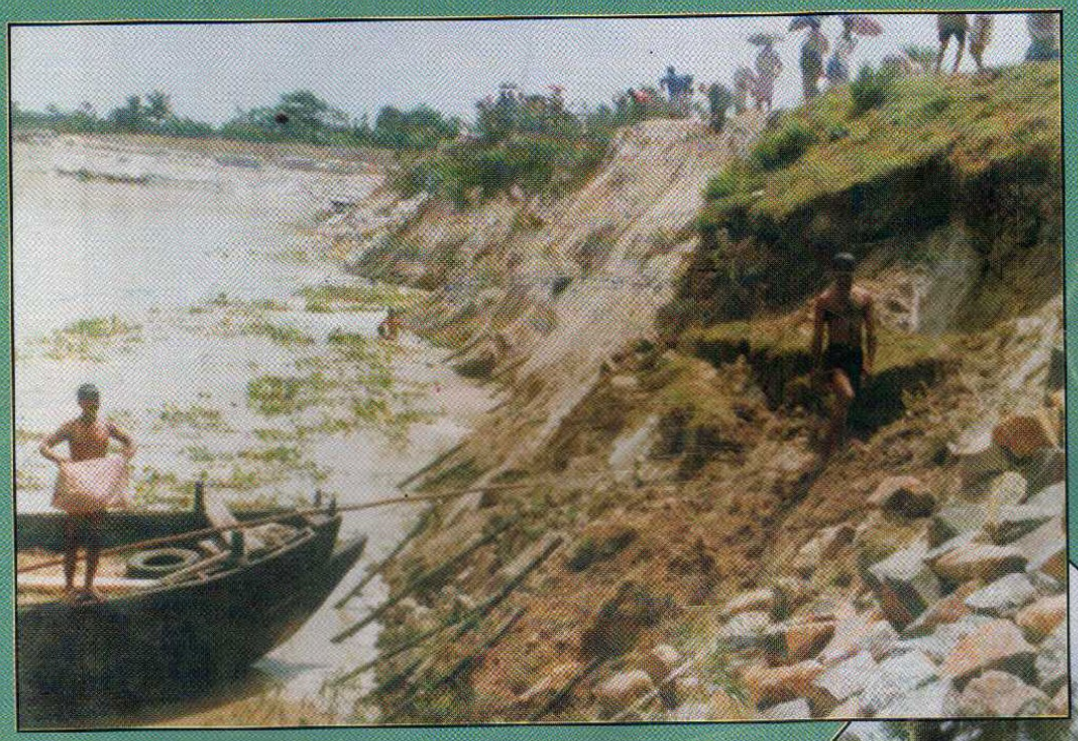

পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত নদ-নদীর অধিকাংশ
আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃদেশীয়। ফলে এ রাজ্যে
সাধারণ বৃষ্টিপাত হলে বা বৃষ্টিপাত না হলেও শু
রাজ্যের বাইরের অতি বৃষ্টিপাতও এ-রাজ্যে
দুর্দশার কারণ ঘটায়। গত জুলাই-আগস্ট
২০০৩-এ সুদূর মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যাঞ্চলে অতি
বৃষ্টিপাতের ফলে জলস্রোত উপনদীর মাধ্যমে
যমুনায় প্রবাহিত হয়ে গঙ্গায় প্রচণ্ড জলস্ফীতি
কারণ ঘটায়। ফলে কালিয়াচক, পঞ্চানন্দপুর
ভয়াবহভাবে গঙ্গার ভাঙন হয় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চ
গঙ্গার অতল তলে তলিয়ে যায়। এমনক
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগে
ঐতিহ্যপূর্ণ গঙ্গাভবনকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়।